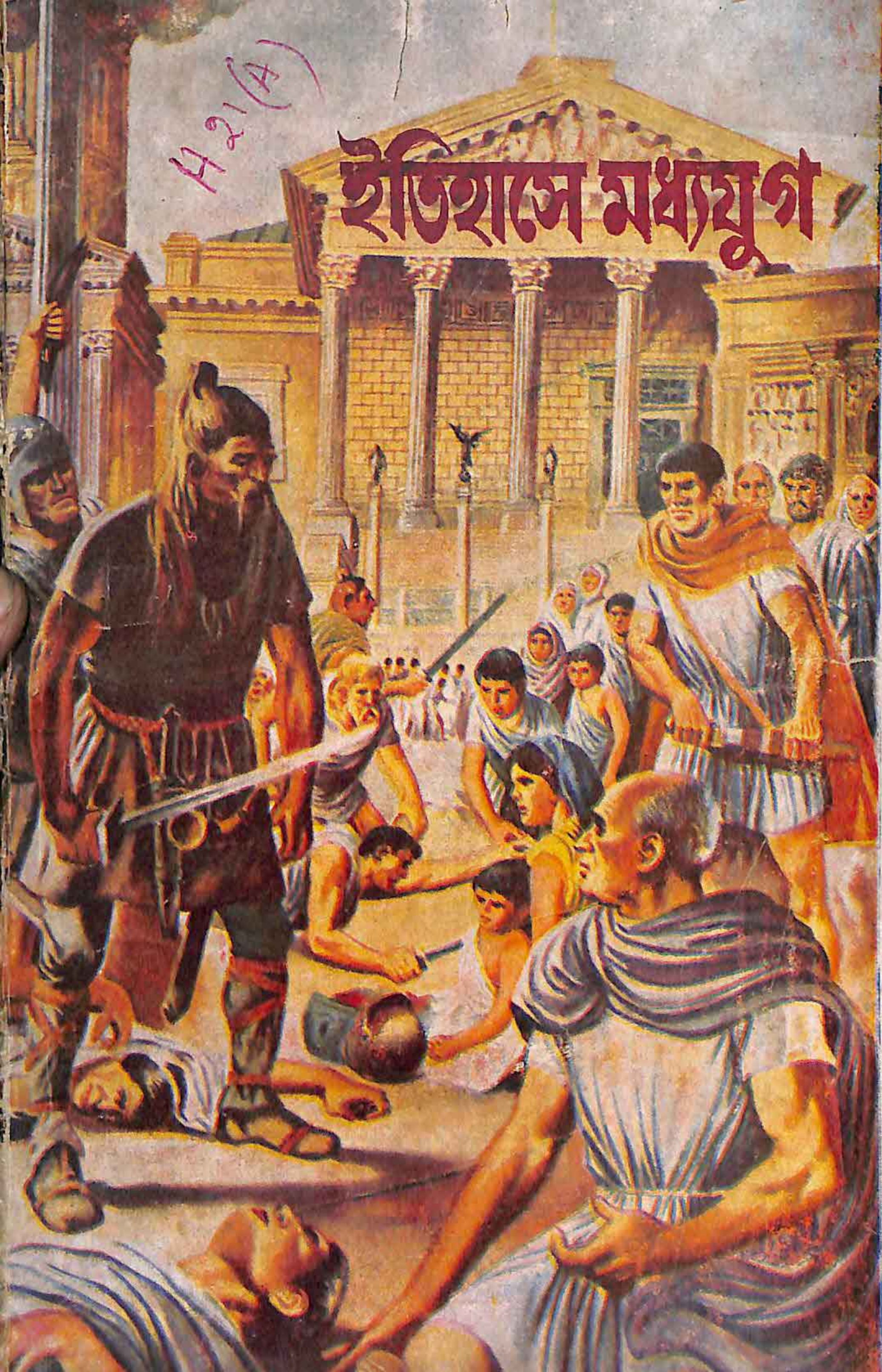
ইতিহাসে মধ্যযুগ



(Approved by the West Bengal Board of Secondary Education as a Text Book on History for Class VII of all High and Junior High Schools of West Bengal and Tripura.
Vide T. B. No. VII/H/81/65, Dated 8. 1. 81

ইতিহাসে মধ্যযুগ

[সপ্তম শ্রেণীর জন্য]

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম. এ (ডবল), বি. টি.
প্রধান শিক্ষক, বাবনাড়া উচ্চবিদ্যালয়, হাওড়া

ও

শ্রীশুভময় মুখোপাধ্যায়, এম. এ., বি. টি.
প্রধান শিক্ষক, থানা মাকুয়া আদর্শ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, হাওড়া

[ভারত সরকারের সহায়তায় প্রাপ্ত স্বল্পমূল্যের কাগজ দ্বারা মুদ্রিত ।]

মন্ডল এন্ড সন্স
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক
১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রকাশক ঃ
শ্রীসুধীরকুমার মণ্ডল
মণ্ডল এণ্ড সন্স
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট কলিকাতা—৭০০ ০৭৩

দ্বিতীয় সংস্করণ, নভেম্বর, ১৯৮০
পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত তৃতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারী, ১৯৮১
চতুর্থ মুদ্রণ, জানুয়ারী, ১৯৮২
পঞ্চম মুদ্রণ - ১৯৮৫

প্রচ্ছদ পরিচিতি ঃ
৪১০ খ্রীষ্টাব্দে রোমে অরক্ষিত নাগরিকদের উপর
ভিসিগথদের অত্যাচারের দৃশ্য।

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ শ্রীনারায়ণ দেবনাথ।
অলংকরণ ঃ শ্রীপ্রবীরকুমার কর্মকার।

মূল্য ঃ ১০·৫০ টাকা

মুদ্রক :
প্রসেস "এন" প্রিণ্ট
১৭, আই. সি. বোস
রোড
হাওড়া - ৯

সূচীপত্র



ক্রুসেডের অভিযান

প্রথম অধ্যায়

মধ্যযুগ কথাটির অর্থ

মানব জাতির ক্রমোন্নতি ও সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারাই হলো ইতিহাস এবং এই ধারা নিরবিচ্ছিন্ন গতিতে এগিয়ে চলেছে। ইতিহাসের এই ধারায় বৈশিষ্ট্যময় তারতম্যগুলি বুঝবার সুবিধার জন্য ইতিহাসকে কয়েকটি যুগ বা পর্যায়ে ভাগ করা হয়ে থাকে।

যুগবিভাগের যৌক্তিকতা ঃ প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক—সাধারণতঃ এই তিন পর্যায়ে মানব সভ্যতাকে ভাগ করে ইতিহাস লেখা হয়। এক একটি ভাগ দিয়ে সভ্যতার এক একটি স্তরকে বোঝান হয়। ঐ স্তর উল্লেখ করলে মানুষ সেই সময় কতখানি উন্নত ছিল, তাদের সমাজ ব্যবস্থাই বা কেমন ছিল, তা সহজেই বোঝা যায়। কোন সন-তারিখ দিয়ে ঐতিহাসিক যুগের সীমারেখা নির্ধারণ করা যায় না। ঐতিহাসিক যুগ-সমূহের বিবর্তন হয় ক্রমান্বয়ে, অত্যন্ত ধীরগতিতে। রাত শেষ হয়ে যেভাবে দিনের শুরু হয়, ঠিক তেমনি সকলের অজানিত ভাবে মানুষের সভ্যতা যুগ থেকে যুগান্তরে উপনীত হয়।

প্রত্যেক যুগের মানুষের চিন্তা ও কাজের মধ্যে কোন না কোন বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। এই বৈশিষ্ট্যকেই বলা হয় যুগের ধর্ম। নতুন যুগ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যে আগের যুগের ধর্ম একেবারে বিলীন হয়ে যাবে, তারও কোন সংগত কারণ নেই। পুরানো যুগ অতি ধীরে ধীরে সকলের অলক্ষ্যে তার স্বকীয়তা হারিয়ে নতুনের মধ্যে মিশে যায়। এইভাবেই একদিন প্রাচীন যুগের সব সত্তা মধ্যযুগের মধ্যে বিলীন হয়ে গিয়েছিল।

মধ্যযুগের স্থিতিকাল ঃ সাধারণভাবে ঐতিহাসিকরা খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকের শেষ ভাগ থেকে পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত সময়কালকে মধ্যযুগ বলে থাকেন। এঁদের মতে ৪৭৬ খৃষ্টাব্দে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতনের সময়কে প্রাচীন যুগের সমাপ্তিকাল বলে মনে করা হয়। এই সময় থেকে প্রায় হাজার বছর পরে তুর্কীদের কাছে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের পতনের সময়

(১৪৫৩ খৃঃ) পর্যন্ত সময়কালকে সাধারণ ভাবে ইউরোপের ইতিহাসে মধ্যযুগ বলা হয়। ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দের পর থেকে ইউরোপে সাংস্কৃতিক জাগরণ ও প্রগতিমূলক এক নতুন যুগের সূচনা হয়। এই যুগই ইতিহাসে আধুনিক যুগ বলে পরিচিত। সুতরাং প্রাচীন ও আধুনিক যুগের মধ্যবর্তী সময়কে বলা হয় মধ্যযুগ। অতএব ইউরোপের ইতিহাসে মধ্যযুগ বলতে মোটামুটিভাবে হাজার বছর (৪৭৬ খৃঃ থেকে ১৪৫৩ খৃঃ) সময়কালকে বুঝায়।

মানুষের সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারা বিশ্লেষণ করেই মধ্যযুগ নামক কালপর্বটি স্থির করা হয়েছে। পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে ইউরোপে রেনেসাঁস বা নবজাগরণের প্রভাবে যখন নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া শুরু হলো, মানুষ যখন মূল্যবোধে জীবন ও সমাজকে বিচার করতে আরম্ভ করল, প্রাচীন যুগের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে তার মনে যখন জানার আগ্রহ প্রবল হয়ে উঠল, তখন থেকেই ইতিহাসে আধুনিক যুগের সূত্রপাত। তাই প্রাচীন যুগের অবসান থেকে এই প্রাক-নবজাগরণের মধ্যবর্তী সময়-কালকেই ঐতিহাসিকরা চিহ্নিত করেছেন 'মধ্যযুগ' রূপে।

মধ্যযুগ সব জায়গায় একই সময় শুরু হয়নি ঃ পৃথিবীর সব দেশের মানুষ একই সাথে সভ্যতার পথে যাত্রা শুরু করেনি, এক দেশের মানুষ যখন দল বেঁধে সমাজ গঠন করে বাস করছে, সেই সময় হয়ত আর এক দেশে চলেছে মানুষের গুহাজীবন। সুতরাং সকল দেশের ইতিহাসে মধ্যযুগ বলতে নির্দিষ্ট কোন সময়কে বুঝায় না।

রোম সাম্রাজ্যের ভাঙন ও মধ্যযুগের সূচনা ঃ ইউরোপের ইতিহাসে গ্রীক ও রোমান জাতির কীর্তি-কাহিনী নিয়েই প্রাচীন যুগের ইতিহাস রচিত হয়। পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে যখন রোমানদের পতন সুনিশ্চিত হলো, তখন থেকেই ইতিহাসে মধ্যযুগের সূচনা। ৪৭৬ খৃষ্টাব্দে ভ্যাণ্ডাল, গথ প্রভৃতি বর্বর জাতিগুলির আক্রমণে রোমের সম্রাট আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। এর পর থেকেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বর্বর জাতিগুলির রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। যেখানেই বর্বর জাতিগুলির রাজ্য গড়ে উঠেছে, সেখানেই তাদের রুচি অনুযায়ী সমাজ, শিক্ষা, রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলা

হয়েছে। মধ্যযুগের ইউরোপের সভ্যতা বলতে তাই বর্বর জাতির সভ্যতাই বুঝায়। মোটামুটি ভাবে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপের ইতিহাসে বর্বর শাসনের সুস্পষ্ট ছাপ লক্ষ্য করা যায়।

ইতিহাসের অসম ধারা ঃ পঞ্চম শতকের শেষ ভাগে ইউরোপে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর এইভাবে যে মধ্যযুগ বা সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সূচনা হয়, পৃথিবীর সব দেশে একই সময়ে, একই পরিবেশে কিংবা একই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তা বিকশিত হয়নি। এটাই স্বাভাবিক। কারণ ইতিহাসের চাকা একইভাবে সব দেশে একই সন তারিখের পথ ধরে গড়িয়ে যায় না। তাই বিচিত্র সব বৈশিষ্ট্যের দ্বারা মধ্যযুগ চিহ্নিত হয়ে আছে পৃথিবীর দেশে দেশে। তবুও ইউরোপে মধ্যযুগীয় সভ্যতার কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ থেকে ভারতবর্ষেও মধ্যযুগের আবির্ভাবকাল সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা করা যায়।

ভারতবর্ষে মধ্যযুগের সূচনা ঃ ভারতবর্ষে প্রাচীন যুগের সবচেয়ে গৌরবময় ইতিহাস গুপ্তবংশীয় রাজাদের। পৌরাণিক যুগের ঐতিহ্যকে গুপ্তরাজারাই সার্থক ভাবে রূপায়ণ করতে চেষ্টা করেছিলেন। তার ফলে গুপ্ত আমলে ভারতবর্ষ বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প ও বাণিজ্যে জগতে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করতে পেরেছিল। গুপ্তরাজাদের শাসনকাল তাই প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার পরিপূর্ণতার যুগ। হূণ আক্রমণের ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্য ছারখার হয়ে যায়। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে গুপ্ত রাজবংশের পতন হলে এদেশে মধ্যযুগের সূচনা হয় বলে অনেকেই মনে করেন। অনেকে অবশ্য আরও আগে থেকেই ভারতবর্ষে মধ্যযুগ আরম্ভ হওয়ার আভাস লক্ষ্য করেছেন। এই যুগের একটা বৈশিষ্ট্য হলো সামন্ত প্রথা। এই সামন্ততান্ত্রিক সমাজে জমির মালিক ছিলেন সামন্ত প্রভুরা। সাধারণ কৃষকরা ছিল ভূমিদাস। এরা সামন্ত-প্রভুদের জমি চাষ করত এবং উৎপন্ন ফসলের একাংশ সামন্তপ্রভুদের হাতে তুলে দিত। এক সময় পৃথিবীর সব দেশেই এই প্রথা প্রচলিত ছিল, কোথাও বা এখনও আছে। ভারতে রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে সামন্ত প্রথার প্রভাব লক্ষ্য

করা যায় পঞ্চম শতাব্দী থেকেই। যেহেতু অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি তখনও স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠেনি, সেজন্য ষষ্ঠ শতাব্দী থেকেই মধ্যযুগের আবির্ভাব কাল নির্ণয় করাই যুক্তিযুক্ত। এই সময় থেকে আরম্ভ করে মোটামুটি পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত কালপর্বকে ভারতবর্ষে মধ্যযুগ বা সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার কাল হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

যুগ পরিবর্তনের বিভিন্ন ধারা : মধ্যযুগে ইউরোপ, ভারত ও এশিয়ার অন্যান্য দেশের সমাজ, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্র-কাঠামোর মধ্যে অনেক সাদৃশ্য থাকলেও মনে রাখতে হবে যে, পৃথিবীর কোন দেশেই একটি যুগের শেষ ও নতুন যুগের শুরু, শুধুমাত্র সন তারিখ দিয়ে বিচার করা যায় না। কারণ সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রজীবনে দীর্ঘকাল ধরে ভাঙাগড়ার কাজ চলে। সুতরাং পরিবর্তনের ধারায় নতুন ও পুরানো উপাদান বহুকাল পর্যন্ত একত্রে মিলে মিশে থাকে। আবার কালের ধারায় নতুন যুগের নতুন শক্তির চাপে পুরানো কালের রেশও ধীরে ধীরে মুছে যায়। মধ্যযুগে একসময়ে চলছিল বর্বর নিষ্ঠুরতা আবার অন্য সময়ে দেখা যায় ধর্মপ্রচার ও শিল্প-বিজ্ঞানের প্রসার।

একথাও বলা যায় যে, পুরানো সমাজ-জীবনের মধ্যেই পরিবর্তনের শক্তি ও উপাদান জন্ম নেয় এবং তার শক্তি যখন ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে, তখন পুরানো সমাজ-জীবনের রূপান্তর ঘটে, দেখা দেয় এক নতুন সমাজ-জীবন। এইভাবে প্রাচীন যুগের সমাজব্যবস্থা সবার অলক্ষ্যে ধীরগতিতে মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে বিলীন হয়ে গিয়েছিল।

কালপঞ্জী

ইতিহাসে মধ্যযুগের কালপর্ব—৪৭৬ খৃষ্টাব্দ—১৪৫৩ খৃষ্টাব্দ।

পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন—৪৭৬ খৃষ্টাব্দ।

ভারতবর্ষে মধ্যযুগের কালপর্ব—আনুমানিক পঞ্চম খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগ থেকে পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দ।



অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ **১ নম্বর**

১. ইতিহাসকে কয়টি যুগে ভাগ করা হয় ?
২. ইউরোপের ইতিহাসে কত খৃষ্টাব্দ থেকে মধ্যযুগের সূচনা হয় ?
৩. ইউরোপের ইতিহাসে মধ্যযুগ কতদিন স্থায়ী হয়েছিল ?
৪. কত খৃষ্টাব্দে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন হয় ?
৫. ভারতবর্ষে মধ্যযুগ কখন থেকে শুরু হয় ?
৬. পৃথিবীর সব দেশে কি একই সঙ্গে মধ্যযুগের বিকাশ হয়েছিল ?

নির্দেশক প্রশ্ন ✻ ✻ ✻ ✻ **তিন নম্বর**

১. ইউরোপে মধ্যযুগ বলতে কোন সময়কে বুঝায় ?
২. ভারতবর্ষে কখন মধ্যযুগের আরম্ভ ও শেষ ধরা হয় ?
৩. ভারতবর্ষে মধ্যযুগের দু-একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।

রচনাত্মক প্রশ্ন ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ **৯ নম্বর**

১. ইতিহাসকে কয়টি যুগে ভাগ করা হয়েছে ? এই যুগবিভাগের যৌক্তিকতা তোমার নিজের ভাষায় বিবৃত কর ? [৪+৫]
২. 'মধ্যযুগ' কথাটির অর্থ ও তাৎপর্য কি ? ইতিহাসে মধ্যযুগ বলতে কি বোঝায় সংক্ষেপে লেখ। [৯]
৩. পৃথিবীর সব জায়গায় যে একই সঙ্গে মধ্যযুগের বিকাশ হয়নি তা আলোচনা করে বুঝিয়ে দাও। [৯]
৪. ভারতবর্ষে মধ্যযুগের বিকাশ সম্বন্ধে যা জান নিজের ভাষায় লেখ। [৯]
৫. যুগ-পরিবর্তনের বিভিন্ন ধারা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর। [৯]



দ্বিতীয় অধ্যায়

ইউরোপীয় ইতিহাসে মধ্যযুগ

খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে রোমের প্রজাতান্ত্রিক সরকারের নেতৃত্বে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল। ইতালি, গ্রীস, ফ্রান্স, জার্মানির দক্ষিণ অংশ, ইংল্যাণ্ড (বৃটেন), মিশর, সিরিয়া ও পারস্য ছিল ঐ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। পরবর্তিকালে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেও রোমান সাম্রাজ্যের উন্নতি অব্যাহত থাকে। রোমান সাম্রাজ্যের ইতিহাসে অন্যতম প্রধান ঘটনা হলো, উত্তর ও পূর্বদিক থেকে বিভিন্ন বর্বর জাতি-উপজাতিদের ক্রমাগত দক্ষিণ ও পশ্চিমে সদলে বসবাস করার জন্য অভিযান। বর্বর জাতিদের মধ্যে **জার্মান ও হূণরাই** ছিল প্রধান। জার্মানরা আবার ফ্রাঙ্ক, ভ্যাণ্ডাল, গথ প্রভৃতি উপজাতিতে বিভক্ত ছিল। এই অভিযান প্রথমে শুরু করেছিল হূণ উপজাতির লোকেরা।

হূণদের আগমন ঃ হূণরা ছিল মোঙ্গল জনগোষ্ঠীর একধরনের যাযাবর উপজাতি। এরা দেখতে যেমন ছিল কদাকার, তেমনি ছিল স্বভাবে অত্যন্ত নিষ্ঠুর। এরা নানা ধরনের লতা, গুল্ম ও কাঁচা মাংস খেত। এদের স্ত্রী-পুরুষ সকলে ঘোড়ায় চড়তে পটু ছিল। সম্ভবতঃ চীন দেশের সীমান্তে হূণদের আদি বাসভূমি ছিল। চীন সাম্রাজ্যের উপর দীর্ঘকাল ধরে হামলা চালাবার পর সেখানে এক বিশাল প্রাচীর তৈরি করা হলে হূণ জাতি দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। একদল গেল ভারতবর্ষের দিকে, অন্যদল অগ্রসর হলো ইউরোপের পথে। ইউরোপগামী হূণরা উরাল পর্বত ও কাস্পিয়ান সাগরের মধ্যবর্তী পথ ধরে চলতে চলতে, রাশিয়ার তৃণভূমি অতিক্রম করে ক্রিমিয়ায় উপস্থিত হয়। হূণরা আসার আগে থেকেই জার্মান উপজাতিরা বাল্টিক সাগরের তীরবর্তী দেশগুলি থেকে দলে দলে রোম সাম্রাজ্যের সীমান্তে এসে বাস করছিল। কৃষ্ণসাগরের উত্তর দিকে হূণদের সঙ্গে সর্বপ্রথম পূর্বগথ জাতির সংঘর্ষ হয়। পূর্বগথরা হেরে গিয়ে ডেসিয়া প্রদেশে পশ্চিমগথদের সঙ্গে মিলে মিশে বাস করতে থাকে। হূণদের ভয়ে ভীত হয়ে গথরা রোম সাম্রাজ্যের ভিতরে ঢুকে পড়ে। তাদের দেখাদেখি অন্যান্য উপজাতিও রোমে

ঢুকে পড়ে। এই সময়টাকে বলা হয় দেশান্তর গমনের যুগ। অপর পক্ষে হূণরা আধুনিক হাঙ্গেরীর **থিবস** নদীর উপত্যকায় একটি রাজ্য স্থাপন করে বসবাস শুরু করে। দীর্ঘদিন ধরে তারা এখান থেকে আর অগ্রসর হয়নি।

পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতন : শাসন কাজের সুবিধার জন্য চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে রোম সাম্রাজ্য দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। জার্মান ও হূণদের আক্রমণ প্রধানতঃ পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যে ঘটেছিল। পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের সম্রাটগণ কখনও অর্থ, কখনও নানাপ্রকার সুযোগ-সুবিধা দিয়ে এদের নিরস্ত করতেন। সম্রাট থিয়োডোসিয়াসের এক পুত্র **হনোরিয়াস** থাকতেন রোমে। তাঁর রক্ষকরূপে নিযুক্ত ছিলেন ভ্যাণ্ডাল উপজাতি সর্দার **স্টিলিকো**। সম্রাটের অকর্মণ্যতার সুযোগে স্টিলিকো সাম্রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন। হনোরিয়াস ভীত হয়ে তাঁর প্রাণদণ্ড দিলেন, এর ফলে চারিদিকে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। অসামান্য দক্ষতায় স্টিলিকো জার্মান জাতি-গুলিকে সম্রাটের পদানত করে রেখেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে জার্মানরা সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে স্বাধীনতা ঘোষণা করল। পশ্চিম গথ জাতি রোমনগরী লুটতরাজ করে অগ্নিসংযোগ করল। এই সুযোগে ভ্যাণ্ডালরাজ **গেইসেরিক** রোম আক্রমণ করে লুটতরাজ করলেন। এরপর পশ্চিম রো সাম্রাজ্যে জার্মানরাই প্রাধান্য



স্টিলিকো

বিস্তার করে নিজেদের খেয়াল খুশী মত সম্রাট নির্বাচন ও অপসারণ করতে লাগল। অবশেষে ৪৭৬ খৃষ্টাব্দে ওডোয়াকার নামে একজন জার্মান দলপতি শেষ সম্রাট রমুলাস অগাস্টাসকে সিংহাসন থেকে সরিয়ে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের অবসান ঘটালেন।

মানব সভ্যতায় রোমান জাতির অবদান **:** পশ্চিম রোম সাম্রাজ্য বিনষ্ট হলেও সভ্যতার ইতিহাসে রোমান জাতির অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। রোমানদের উন্নত শাসনপদ্ধতি এখনকার যুগেও গ্রহণযোগ্য। আধুনিক ইউরোপের অধিকাংশ জাতি রোমান আইনের আদর্শ মেনে চলে। বিশাল সাম্রাজ্যের সর্বত্র এক আইন, এক শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন রোমান শাসকদের অসামান্য রাষ্ট্রনীতি-জ্ঞানের পরিচায়ক। এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা—এই তিনটি মহাদেশ ভৌগোলিক দিক থেকে পরস্পর পৃথক হয়েও রোমান জাতির অধীনে রাজনৈতিক ঐক্যলাভ করেছিল। বর্বর জাতির আক্রমণে এই ঐক্য সাময়িকভাবে বিনষ্ট হলেও নবম শতাব্দীতে পবিত্র রোম সাম্রাজ্য গঠনের মধ্য দিয়ে এই ঐক্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

অ্যালারিক **:** রোম সাম্রাজ্যের পতনে যাঁদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, তাঁদের মধ্যে অ্যালারিক, অ্যাটিলা ও গেইসেরিকের নাম উল্লেখযোগ্য। পশ্চিমগথ জাতির নায়ক অ্যালারিক ছিলেন দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। ৩৯৫ খৃষ্টাব্দে তিনি সসৈন্যে গ্রীসে প্রবেশ করে লুটপাট করেন। পূর্ব রোম সম্রাট আর্কেডিয়াস তাঁকে এপিরাসে বসবাসের অনুমতি দিয়ে তুষ্ট করেন। এরপর অ্যালারিক ইতালিতে প্রবেশ করতে গেলে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের সেনাপতি স্টিলিকো তাঁকে প্রতিহত করেন। স্টিলিকোর মৃত্যুর পর অ্যালারিক রোম দখলে অগ্রসর হন। মাত্র অল্পকাল অবরোধের পর অ্যালারিক রোম অধিকার করেন (৪১০ খৃঃ)। এর পর থেকেই রোমে বর্বর উপজাতিদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো।

হুণনেতা অ্যাটিলা **:** ইউরোপের ইতিহাসে পঞ্চম শতককে বলা হয় হুণদের শতক। বিগত কয়েক শ' বছর ধরে হুণরা ক্রমেই পশ্চিমমুখী অভিযান করে ইউরোপে ঢুকে পড়ে এবং ভ্যাণ্ডাল, গথ প্রভৃতি জার্মান

উপজাতিদের পরিত্যক্ত অঞ্চল দখল করে। পঞ্চম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তাদের মধ্যে আবির্ভূত হন একজন দক্ষ সেনাপতি ও দলনেতা। তাঁর নাম অ্যাটিলা। অ্যাটিলা ছিলেন প্রচণ্ড পরাক্রমশালী ও রণপণ্ডিত। তিনি নাকি ছিলেন দেখতে খুবই কুশ্রী। তাঁর চেহারা ছিল বেঁটে, বুকের ছাতি চাওড়া, মাথা চেপটা। তাকে লোকে ভগবানের অভিশাপ বলে অভিহিত করত। তাঁর নিষ্ঠুরতা একটি প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়। অ্যাটিলা কেবল হূণদের নেতা ছিলেন না, তিনি ছিলেন ইউরোপ থেকে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত এক বিশাল ভূখণ্ডের অধীশ্বর। রোমান জাতির অনুকরণে অ্যাটিলা তাঁর রাজসভায় কিছু কিছু আড়ম্বর প্রবর্তন করেছিলেন। ৪৫১ খৃষ্টাব্দে অনুগত হূণ ও জার্মান সৈন্যদের নিয়ে তিনি পশ্চিম দিকে অভিযান করেন। অনেকের ধারণা, মিত্র ভ্যাণ্ডালরাজ গেইসেরিককে পশ্চিম গথদের আসন্ন আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্যই তাঁর এই অভিযান। তবে সম্ভবতঃ অর্থ সংগ্রহই ছিল অ্যাটিলার প্রধান উদ্দেশ্য। যা হোক, হূণ বাহিনী ট্রায়ার, মেত্স ও রীম্‌স লুট করার পর প্যারিস আক্রমণ না করে অর্লিয়ন্সের



অ্যাটিলা

দিকে অগ্রসর হলো। রোমান সেনাপতি ইটিয়াস তাদের ক্যাটালনিয়ান ফিল্ডের যুদ্ধে পরাজিত করেন। এরপর অ্যাটিলা ইতালিতে প্রবেশ করে

রোম পর্যন্ত অগ্রসর হলেন, কিন্তু অজ্ঞাত কারণে ঐ শহর আক্রমণ না করেই ফিরে এলেন। শোনা যায়, পোপ **প্রথম লিও** এবং **সেন্ট পিটার** ও **সেন্ট পলের** বিশেষ অনুরোধেই অ্যাটিলা রোমবাসীদের অব্যাহতি দেন। ৪৫৩ খৃষ্টাব্দে অ্যাটিলার মৃত্যু হয়।

ভ্যাণ্ডাল নেতা গেইসেরিক : গেইসেরিক ভ্যাণ্ডাল জাতির নায়ক ছিলেন। পশ্চিমগথ জাতির আক্রমণে **গল** থেকে বিতাড়িত হয়ে তিনি উত্তর আফ্রিকায় চলে যান। সেখানকার রাজনৈতিক গোলযোগের সুযোগে তিনি ভ্যাণ্ডাল রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। সমুদ্রবক্ষে নৌ-যুদ্ধে ভ্যাণ্ডালরা তাদের অপ্রতিহত ক্ষমতা বিস্তার করে। **সিসিলি, কর্সিকা, সার্ডিনিয়া ও বালিয়ারিক** দ্বীপপুঞ্জে তাঁদের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ৪৫৫ খৃষ্টাব্দে গেইসেরিক রোম আক্রমণ করেন এবং দু' সপ্তাহ ধরে অবাধ লুটতরাজ চালান। কিন্তু পোপ প্রথম লিও-র অনুরোধে গির্জাগুলির কোন ক্ষতি করেননি। ৪৭৭ খৃষ্টাব্দে গেইসেরিকের মৃত্যু হয়।

জার্মান জাতির সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মজীবন

রোম সাম্রাজ্যে অনুপ্রবেশকারী জার্মান উপজাতিদের রোমানরা বর্বর বলত। আসলে তারা আদৌ বর্বর বা অসভ্য ছিল না। তারা ছিল আর্য-জাতির এক শাখা। জার্মান উপজাতিরা ছিল দীর্ঘকায়, গৌরবর্ণ ও বলিষ্ঠ। এরা রোম সাম্রাজ্যের উত্তরে অবস্থিত মধ্য ইউরোপের বিস্তীর্ণ অরণ্য ও জলাভূমিতে বাস করত। রোমান ঐতিহাসিক **ট্যাসিটাসের** লেখা **জার্মানিয়া** নামক পুস্তক থেকে সেকালের জার্মানদের জীবনযাত্রা ও রীতিনীতি সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যায়।

রাজনৈতিক জীবন : জার্মানরা ছিল যাযাবর জাতি। তারা শিকার করে, মাছ ধরে ও পশুপালন করে জীবন ধারণ করত। কৃষিকাজে তাদের বেশী উৎসাহ ছিল না। প্রাণধারণের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য তারা কোন মতে সংগ্রহ করত। জার্মানদের মধ্যে যে যত বেশী পশুর মালিক হতো, সে তত ধনী বলে গণ্য হতো। জার্মানরা বেশীর ভাগ গ্রামে বাস করত। যুদ্ধ করতে এরা খুবই উৎসাহী ছিল। ধাতু বা পাথরের তৈরি কুঠার, ছোট

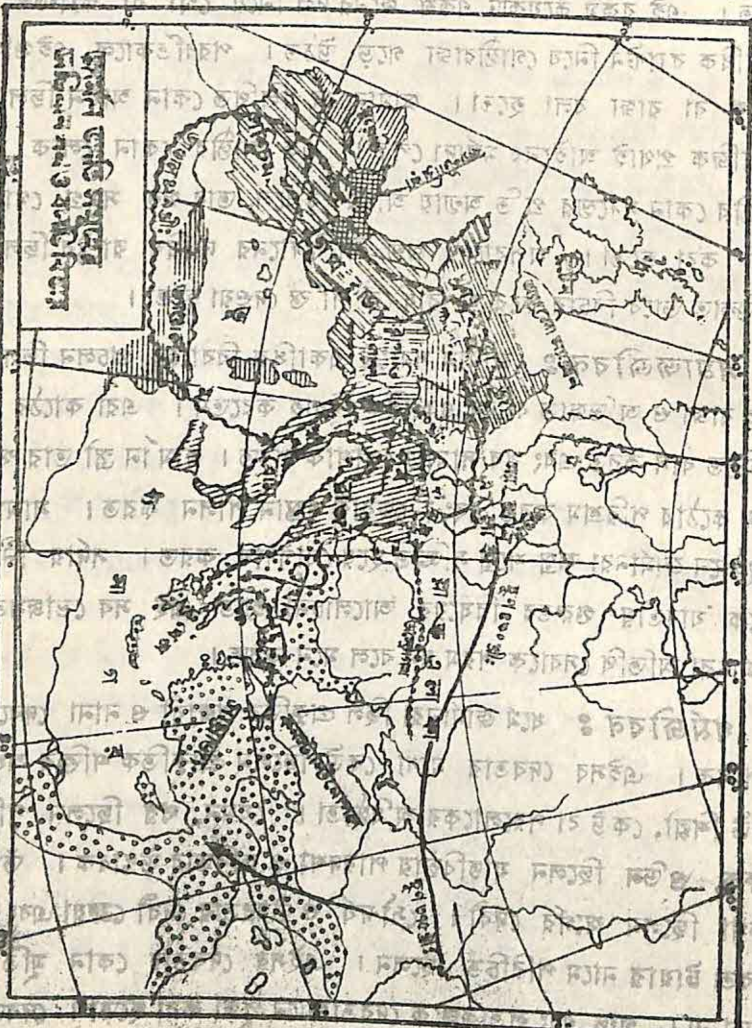
তরবারি, বর্শা ও ধনুক তাদের প্রধান অস্ত্র ছিল। এদের মধ্যে কেবল সর্দাররা ঘোড়ায় চড়ে এবং বাকী সকলে মাটিতে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করত। প্রতি একশ' জন সৈনিক নিয়ে একটি দল গড়া হতো। দলের সকলে এক জায়গায় বাস করত। এই রকম কয়েকটি একশ' জনের দল নিয়ে গৌ বা ক্যান্টন এবং একাধিক ক্যান্টন নিয়ে গোষ্ঠীরাজ্য গড়ে উঠত। পরবর্তিকালে এইগুলিকে **রেইখ** বা রাজ্য বলা হতো। জার্মানদের লিখিত কোন আইন ছিল না। সামাজিক প্রথাই আইনের মর্যাদা পেত। এক গোষ্ঠীর কোন লোক অপর গোষ্ঠীর কোন সদস্যের প্রতি অন্যায় আচরণ করলে, তার জন্য সমগ্র গোষ্ঠীকে দায়ী করা হতো। অপরাধের জন্য শাস্তিদানের দায়িত্ব রাষ্ট্রের ছিল না। ব্যক্তিগত ভাবে বিচার করে অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া হতো।

সমাজজীবন ঃ জার্মান সমাজে একাধিক বিবাহের প্রচলন ছিল না। তবে রাজা ও অভিজাত ব্যক্তি একাধিক বিবাহ করতেন। এরা কাঠের তৈরী বাড়িতে বাস করত এবং খুব সামান্য পোশাক পরত। জার্মান স্ত্রী তার স্বামীর সঙ্গে কঠোর পরিশ্রম করত এবং নিজেরাই সন্তান পালন করত। সামাজিক অনুষ্ঠানে জার্মানরা অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে যোগদান করত। সর্দার নির্বাচন থেকে যাবতীয় গুরুতর বিষয়ের আলোচনা হতো এই সব ভোজসভায়। জার্মানরা অতিথি সেবাকে পরম ধর্ম বলে মনে করত।

ধর্মজীবন ঃ ধর্মে জার্মানরা ছিল প্রকৃতির পূজারী ও নানা দেবদেবীর উপাসক। এইসব দেবতার মধ্যে কেউ ছিলেন প্রাকৃতিক শক্তির অধীশ্বর, কেউ শিল্পী, কেউ বা পরলোকের অধিষ্ঠাতা। যেমন, **থর** ছিলেন পৃথিবীর রক্ষক, **ওডিন** ছিলেন যাদুবিদ্যায় পারদর্শী ও কবিতার উদ্ভাবক। তাঁর স্ত্রী **ফ্রিগা** ছিলেন স্বর্গের দেবী। সৌন্দর্য ও উর্বরতার দেবী **ফ্রেয়া** এবং যুদ্ধের দেবতা **টায়ার** নামে পরিচিত ছিলেন। এইসব দেবতার কোন মূর্তি গড়া হতো না। গাছ এবং লতাকুঞ্জকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করা হতো। দেবতাদের উদ্দেশ্যে পশুবলি ও মাঝে মাঝে নরবলিরও প্রচলন ছিল।

রোম সাম্রাজ্যে জার্মান বসতি ও জার্মানদের উপর রোমান প্রভাব ঃ জনসংখ্যা বৃদ্ধি, খাদ্যাভাব প্রভৃতি নানান কারণে জার্মান জাতি

বাল্টিক সাগরের তীরবর্তী অঞ্চল থেকে ক্রমশঃ দক্ষিণ দিকে সরে এসে রোম সাম্রাজ্যের সীমান্তে উপস্থিত হয়। গথরাই প্রথমে কৃষ্ণসাগরের তীরে ডাচিয়া অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। ভ্যাণ্ডালরা উত্তর জার্মানিতে তাদের প্রাধান্য স্থাপন করে। মেইন নদীর উপত্যকায় বার্গাণ্ডিয়ানদের আধিপত্য



প্রতিষ্ঠিত হয়। আধুনিক ফ্রান্স ও স্পেনে ফ্রাঙ্ক জাতি এবং ডেনমার্কের দক্ষিণাঞ্চলে স্যাক্সনরা রাজ্য স্থাপন করে। রোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করার ফলে বর্বর জার্মান উপজাতিদের সঙ্গে উন্নত রোমানদের ক্রমেই

নানাভাবে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠে। রোমে খৃষ্টধর্ম সরকারীভাবে গৃহীত হওয়ার পর তার প্রভাবে বর্বরদের জীবনধারারও পরিবর্তন হতে থাকে। ফলে, একদিকে ল্যাটিন ভাষার প্রভাবে তাদের এযাবৎ কালের কথ্যভাষা যেমন রূপান্তরিত হয়, অন্যদিকে খৃষ্টধর্ম ও রোমান সভ্যতার প্রভাবে তাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবনও বদলে যায়। জার্মান এবং রোমান সভ্যতা ও সংস্কৃতির দুই ধারা মিশে এক নতুন সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে উঠে। এতে খৃষ্টান ধর্মের প্রভাবও জার্মান উপজাতিদের উপর এসে পড়ে। উপজাতিদের নিজেদের কোন নির্দিষ্ট ধর্ম ছিল না। সুতরাং তারা খৃষ্টান ধর্ম ও রোমের সংস্কৃতি গ্রহণ করে। পরবর্তিকালে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হলে এই পরিবর্তন দ্রুতগতিতে ঘটতে থাকে। বর্বর উপজাতিদের দ্বারা রোমান সাম্রাজ্যের পতন হলেও রোমান সভ্যতা আত্মস্থ করে তারা ইউরোপের জাতিগোষ্ঠী ও সমাজ গড়ে তোলে।

কালপঞ্জী

পশ্চিমী রোমান সাম্রাজ্যের হূণ অভিযান আরম্ভ—চতুর্থ খৃষ্টাব্দ।
সম্রাট থিয়োডোসিয়াসের মৃত্যু—৩৯৫ খৃষ্টাব্দ।
ভিসিগথ নেতা অ্যালারিক কর্তৃক রোম অধিকার ৪১০ খৃষ্টাব্দ।
অ্যাটিলা কর্তৃক পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য আক্রমণ—৪৫১ খৃষ্টাব্দ।
গেইসেরিক কর্তৃক রোম অভিযান—৪৫৫ খৃষ্টাব্দ।
পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন—৪৭৬ খৃষ্টাব্দ।

অনুশীলনী

মৌখিক প্রশ্ন ✻ ✻ ✻ **এক নম্বর**

১. হূণ কাদের বলা হয়? ২. হূণদের আদি বাসভূমি কোথায় ছিল? ৩. ভ্যান্ডাল উপজাতিরা রোমান সাম্রাজ্যের কোন্ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে? ৪. স্টীলিকো কে ছিলেন? ৫. অ্যালারিক কাদের নেতা ছিলেন? ৬. হূণদের নেতা কে ছিলেন? ৭. ভ্যান্ডাল জাতির নায়ক কে ছিলেন? ৮. অ্যাটিলা কত খৃষ্টাব্দে মারা যান? উপজাতিদের সৌন্দর্যের দেবতার নাম কি?

সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন * * * * * * * **তিন নম্বর**

১. বিশাল রোম সাম্রাজ্য দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায় কেন ? [৩]

২. স্টিলিকো কে ছিলেন ? তিনি কি ভাবে ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেন ? [১+২]

৩. পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের শেষ সম্রাট কে ? কে তাঁকে সিংহাসন থেকে সরিয়ে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের অবসান ঘটিয়েছিলেন ? এই ঘটনা কত খৃষ্টাব্দে ঘটেছিল ? [১+১+১]

৪. অ্যালারিক কে ছিলেন ? তিনি কত খৃষ্টাব্দে রোম অধিকার করেন ? [২+১]

৫. অ্যাটিলা কে ছিলেন ? তাঁর সাম্রাজ্য-সীমা কতদূর বিস্তৃত ছিল ? [২+১]

৬. গেইসেরিক কে ছিলেন ? তিনি কোথায় ভ্যাণ্ডাল রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ? [২+১]

সাধারণ প্রশ্ন ---------------------- **নয় নম্বর**

১. হূণ জাতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

২. মানব সভ্যতায় রোমান জাতির অবদান তোমার নিজের কথায় বর্ণনা কর। [৯]

৩. জার্মান জাতির রাজনৈতিক জীবন সংক্ষেপে আলোচনা কর। [৯]

৪ জার্মান জাতির ধর্মব্যবস্থা সংক্ষেপে বিবৃত কর। [৯]

৫. জার্মান উপজাতিদের উপর রোমানদের প্রভাব সংক্ষেপে আলোচনা কর। [৯]

বিষয়মুখী প্রশ্ন ---------------------- **এক নম্বর**

(ক) শূন্যস্থান পূর্ণ কর :

১. হূণরা ছিল —— জনগোষ্ঠীর এক ধরনের যাযাবর উপজাতি।

২. পশ্চিম গথ জাতির নায়ক —— ছিলেন দুর্ধর্ষ যোদ্ধা।

৩. জার্মান দেবতা —— ছিলেন যাদুবিদ্যায় পারদর্শী ও কবিতার উদ্ভাবক

৪. —— ছিলেন জার্মানদের স্বর্গের দেবী।



তৃতীয় অধ্যায়

ইউরোপের অন্ধকার যুগ

ভিসিগথ সর্দার অ্যালারিকের আক্রমণে রোমের পতনের পর পরবর্তী প্রায় চারশ' বছর পর্যন্ত ইউরোপীয় সভ্যতার কোন উল্লেখযোগ্য নিদর্শন চোখে পড়ে না। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের শুরু থেকে পঞ্চম শতকের তৃতীয় পাদ পর্যন্ত বর্বর উপজাতি ভ্যাণ্ডাল, গথ ও হূণদের অবিরাম আক্রমণে রোমান সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হয়। সংস্কৃতি ও সভ্যতার ক্ষেত্রেও রোমান সাম্রাজ্যে তখন শুরু হয়েছিল এক নিদারুণ অবক্ষয়। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর সারা ইউরোপ জুড়ে এই ধারারই রেশ চলে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত।

অন্ধকার যুগের প্রচলিত ধারণা ঃ ইউরোপের ইতিহাসে চতুর্থ থেকে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত সময় কালকে **অন্ধকার যুগ** বলা হয়। বর্বর জার্মান জাতির আক্রমণে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতনের ফলে ইউরোপীয় সভ্যতার ধ্বংস হয়েছিল অনুমান করে, এইরকম নামকরণ করা হয়েছে। প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, জার্মান জাতির অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ইউরোপের পুরানো সভ্যতা ও সংস্কৃতির গতি রুদ্ধ হয়েছিল ; খৃষ্টধর্মের প্রভাব ও জ্ঞানচর্চা বন্ধ হওয়ায় মানুষ আদি বর্বর জীবনে ফিরে গিয়েছিল। কিন্তু এই ধারণা আদৌ সত্য নয়। আসলে অন্ধকার যুগ বলে কিছু নেই— ইউরোপের সভ্যতার অগ্রগতি কোন সময় ব্যাহত হয়নি।

রোমানদের তুলনায় জার্মানরা অনুন্নত ছিল ঠিকই, কিন্তু রোমান সভ্যতার প্রতি তারা বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ছিল না, বরং শ্রদ্ধা ও প্রশংসার মনোভাব পোষণ করত। তারা যে রোমানদের সংস্পর্শে এসে রোমান সভ্যতাকে গ্রহণ করেছিল, তা তাদের পোশাক, অস্ত্র-শস্ত্র ও রীতি-নীতি থেকেই উপলব্ধি করা যায়। সুতরাং রোমানদের কাছ থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা কেড়ে নিলেও তাঁরা পুরানো রোমান সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন।

পূর্বগথ জাতির **রাজা থিওডোরিক** রোমান শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর উপর রাজকার্য পরিচালনা করতেন। গুরুত্বপূর্ণ পদগুলিতে রোমান কর্মচারী নিয়োগ

করতেন। রোমান আইনের সাহায্যে রোমানদের বিচার করা হতো। কেবলমাত্র জার্মানদের জন্য ছিল জার্মান আইন। অন্যান্য জার্মান রাজ্যেও এই একই প্রথার প্রচলন ছিল।

সভ্যতা রক্ষায় মঠের ভূমিকা ঃ বর্বর জার্মানদের আক্রমণের ফলে পশ্চিম ইউরোপের রোমান সভ্যতা বিপর্যস্ত হলেও খৃষ্টান ধর্মাধিষ্ঠানগুলি শিক্ষাচর্চা অক্ষুণ্ণ রেখেছিল। খৃষ্টধর্মের মাধ্যমে বর্বর জার্মানদের সভ্য করে তোলার দায়িত্ব ছিল চার্চের। চার্চ ছাড়াও স্বাধীনভাবে যে সব মঠ গড়ে উঠেছিল সেগুলিও শিক্ষার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। সাধারণতঃ **সেণ্ট বেনেডিক্টের** মত উৎসাহী সন্ন্যাসীরা নিজেদের প্রচেষ্টায় এইসব মঠ স্থাপন করতেন। মঠের সন্ন্যাসীরা পবিত্র জীবন যাপন করতেন। সাধারণ মানুষের কাছে সন্ন্যাসীদের জীবনধারা আদর্শস্বরূপ ছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীতে পোপ **গ্রেগরীর** সময়ে চার্চ ও মঠের পারস্পরিক সহযোগিতায় জার্মানদের খৃষ্টধর্মে দীক্ষা দান করা হয়। মঠবাসী সন্ন্যাসীদের চেষ্টায় আয়ার্ল্যাণ্ডে ব্যাপকভাবে খৃষ্টধর্মের প্রচার হয়। ইংরেজ সন্ন্যাসী **সেণ্ট বনিফেস** জার্মানিতে অনেকগুলি মঠ প্রতিষ্ঠা করে জার্মানদের মধ্যে নতুন প্রেরণার সঞ্চার করেন। আইরিশ সন্ন্যাসী **সেণ্ট কলম্বান** ও তাঁর শিষ্য **সেণ্ট গল** বার্গাণ্ডি, জার্মানি, সুইজারল্যাণ্ড ও ইতালির জার্মান রাজ্যগুলিতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।

জ্ঞানচর্চার ব্যাপক প্রসার ঃ মধ্যযুগীয় ইউরোপের মঠগুলি যে কেবল নৈতিক শিক্ষা দিত, তা নয়। এগুলি ছিল শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র। মঠের অধীনস্থ বিদ্যালয়গুলিতে সর্বসাধারণ বিদ্যাশিক্ষা করতে পারত। এইসব বিদ্যালয়ে চাষবাস, চারু ও কারুশিল্পের চর্চা হতো। সে যুগে রাষ্ট্র পরিচালিত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, চিকিৎসালয়, আদালত বা গ্রন্থাগার ছিল না। মঠই ঐসব যাবতীয় প্রয়োজন মেটাত। এক কথায় মঠ ছিল সে যুগের শিক্ষাসংস্কৃতির ধারক ও বাহক।

বর্বর জাতিগুলির মধ্যে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ছাড়াও মধ্যযুগের মঠগুলির কাছে আধুনিক মানব সভ্যতা বহুলাংশে ঋণী। মঠবাসী সন্ন্যাসীদের চেষ্টায়

গ্রীস ও রোমের বিখ্যাত মনীষীদের অমূল্য রচনাগুলি রক্ষা পেয়েছিল, অন্যদিকে তাঁদের মৌলিক গবেষণায় মানুষের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল।



সন্ন্যাসী পুঁথি নকল করছেন

প্রথম প্রথম মঠের সন্ন্যাসীরা ধর্মগ্রন্থ পাঠের উপযোগী লেখাপড়া শিখতেন। ষষ্ঠ শতাব্দীতে **ক্যাসিওডোরাস** নামে জনৈক রোমান সন্ন্যাসীর চেষ্টায় মঠে ধর্মগ্রন্থ ছাড়াও বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা হয়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত **স্কুইলেস** মঠের সন্ন্যাসীরা পুরানো পুঁথি নকল করাকে দৈনিক কাজের অঙ্গ বলে গ্রহণ করেছিলেন। **ক্যাসিওডোরাস** স্বয়ং গথ জাতির ইতিহাস রচনা করেছিলেন। **ডোনাটাস**-এর রচিত ল্যাটিন ভাষায় ব্যাকরণ, ঐতিহাসিক **বীড-এর** রচিত **অ্যাংলো স্যাক্সন জাতির ইতিহাস**, **ইসিডো-র** লেখা **বিশ্বকোষ**, বিশপ **গ্রেগরীর** রচিত **ফ্রাঙ্ক জাতির ইতিহাস** মধ্যযুগীয় ইউরোপে জ্ঞানচর্চার উপযুক্ত নিদর্শন। তথাকথিত অন্ধকার যুগের ইউরোপে যে সভ্যতার অবলুপ্তি ঘটেনি তার সুস্পষ্ট প্রমাণ এইসব অমূল্য গ্রন্থ।

জার্মানজাতির উপর খৃষ্টধর্মের প্রভাব ঃ রোম সাম্রাজ্যের ভিতরে প্রবেশ করার পর ধীরে ধীরে জার্মানদের সঙ্গে রোমানদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠতে থাকে, ফলে জার্মানদের সামাজিক ও ধর্মজীবনে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়। শুধু বাইরের রীতিনীতি ও আচার-আচরণের ক্ষেত্রেই

নয়, জার্মান জাতির মানসিক ক্ষেত্রেও রোমান সভ্যতার ব্যাপক প্রভাব প্রতিফলিত হয়। বর্বর জীবনে জার্মানরা ছিল প্রকৃতির দাস, ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতির বাইরে তারা অন্য কিছু চিন্তা করতে পারত না। খৃষ্টধর্মের প্রভাবে সমাজ ও রাষ্ট্রের স্বার্থ তাদের কাছে বড় হয়ে উঠল। যুক্তিতর্কের বিচারকে তারা শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করতে শিখল। এইভাবে কিছু খৃষ্টধর্মের প্রভাবে এবং কিছু নিজেদের সৃজনী শক্তির মাধ্যমে তারা ইউরোপে একটি মিশ্র সভ্যতা পত্তন করল।

অনুশীলনী

মৌখিক প্রশ্ন * * * **এক নম্বর**

১. ইউরোপের ইতিহাসে কোন্ সময়কালকে অন্ধকার যুগ বলা হয় ?
২. এই সময়ে বিদ্যাচর্চা কোথায় কেন্দ্রীভূত ছিল।

নির্দেশক প্রশ্ন * * * * **তিন নম্বর**

১. কোন্ বিচারে ঐতিহাসিকগণ অন্ধকার যুগ নামকরণ করেছেন ?
২. অন্ধকার যুগে চার্চের ভূমিকা কি ছিল ?

রচনাত্মক প্রশ্ন * * * * * * * **৯নম্বর**

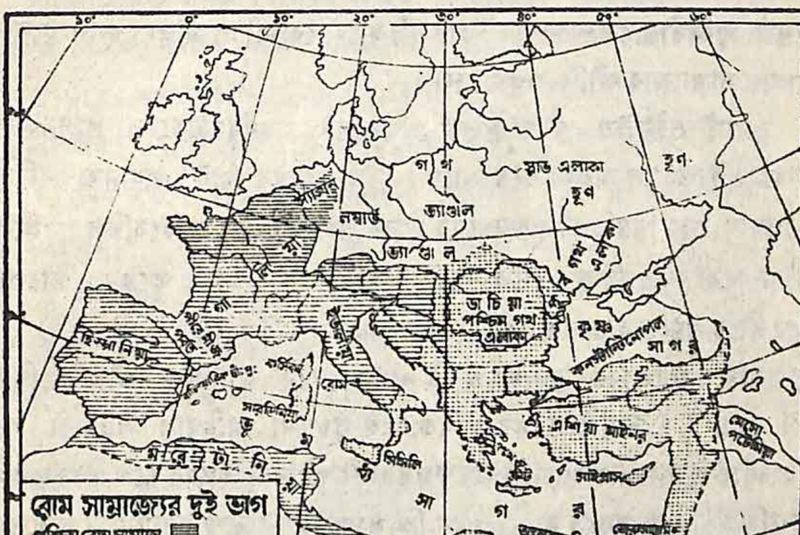
১. কোন্ সময়কে ইউরোপের ইতিহাসে অন্ধকার যুগ বলা হয় ? সত্যই কি এটা অন্ধকারের যুগ ? [২+৭]
২. রোমান সভ্যতার প্রতি জার্মানদের মনোভাব কেমন ছিল ? [৯]
৩. জার্মানদের উপর খৃষ্টধর্মের কি প্রভাব পড়েছিল ? [৯]
৪. মঠগুলি কি ভাবে খৃষ্টধর্ম প্রচারে সাহায্য করেছিল ? [৯]
৫. মঠের সন্ন্যাসীরা সভ্যতা রক্ষায় কোন্ ভূমিকা পালন করেছিলেন ? [৯]
৬. অন্ধকার যুগরূপে বর্ণিত সময়ে কিভাবে শিক্ষা ও জ্ঞানের চর্চা প্রচারিত হয় ? [৯)



চতুর্থ অধ্যায় | বাইজান্টাইন সভ্যতা



খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের শেষদিকে সম্রাট থিওডোসিয়াস রোম সাম্রাজ্যকে দুই ভাগে ভাগ করেন। কৃষ্ণসাগরের তীরে **বাইজান্টিয়াম** ছিল পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী। অতীতে এখানে গ্রীকজাতিরা বসবাস করত। রোমান অধিকারে আসার পর এই অঞ্চলে গ্রীক ও রোমান সংস্কৃতির মিলনের



ফলে এক নতুন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। বাইজান্টিয়ামের নাম থেকে এই সভ্যতার নাম হয় **বাইজান্টাইন সভ্যতা**। পঞ্চম শতাব্দীতে জার্মান জাতির আক্রমণে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটলেও বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য ও সভ্যতার অস্তিত্ব প্রায় এক হাজার বছর বিদ্যমান ছিল।

কনস্টান্টিনোপলের প্রতিষ্ঠা : বাইজান্টিয়াম যে কেবল পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল তা নয়, অবিভক্ত রোম সাম্রাজ্যেও এর গৌরব এবং প্রতিপত্তি ছিল যথেষ্ট। সম্রাট কনস্টানটাইন ৩৩০ খৃষ্টাব্দে এখানে

সুন্দর শহর তৈরি করে রাজধানী স্থাপন করেন। তখন থেকে এর নতুন নাম হয় **কনস্টান্টিনোপল**। কনস্টানেন্টিপলের বর্তমান নাম **ইস্তাম্বুল**। বর্তমানে ইস্তাম্বুল তুরস্কের অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃতির প্রহরায় তিন দিক জলে ঘেরা এই জায়গাটি শত্রুর কাছে ছিল দুর্ভেদ্য। মধ্য এশিয়া, চীন ও ভারতবর্ষের সঙ্গে স্থলপথে এর বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। ফলে অল্পকালের মধ্যেই কনসস্টান্টিনোপল শহরটি একটি বৃহত্তম বন্দরে পরিণত হয়। শহরটি ছিল অত্যন্ত সুরক্ষিত, চতুর্দিকে প্রাচীর বেষ্টিত। শ্বেতমর্মরে মণ্ডিত প্রাসাদ, স্নানাগার ও অসংখ্য বিপণিতে সজ্জিত নগরটি অপূর্ব শোভা ধারণ করেছিল। শহরের মধ্যস্থলে একটি মর্মর স্তম্ভে উৎকীর্ণ ছিল—**'ইহাই পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল'**। পরবর্তিকালে রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস হলেও রোমান সাম্রাজ্যের কীর্তি অক্ষুণ্ণ ছিল।

কনস্টানটাইন ও খৃষ্টধর্ম ঃ সম্রাট কনস্টানটাইনের শাসনকাল খৃষ্টধর্মের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। যীশুখৃষ্টের বাণী প্রধানতঃ দরিদ্র ক্রীতদাস এবং নিম্ন শ্রেণীর জনগণের মনের উপর রেখাপাত করেছিল। ফলে তাদের মধ্যে কিছু কিছু লোক খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করতে শুরু করে। তারপর ধীরে ধীরে খৃষ্টধর্মের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে।

রোম সাম্রাজ্যে এতদিন পর্যন্ত ঐ ধর্মের কোন আইনগত স্বীকৃতি ছিল না। সম্রাট ও তাঁর প্রজাদের অধিকাংশই পুরানো ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী বহু দেবদেবীর উপাসনা করতেন। **একেশ্বরবাদী** খৃষ্টানরা তাঁদের সঙ্গে কোনরকম সামাজিক সম্পর্ক রাখত না। এমন কি সম্রাটের উদ্দেশ্যে যজ্ঞানুষ্ঠান করতেও তারা অসম্মতি প্রকাশ করে। অথচ এই সময় রোমবাসীদের কাছে সম্রাট দেবতার ন্যায় বিবেচিত হতেন। খৃষ্টানদের এরূপ আচরণকে রোমান সম্রাটগণ রাজদ্রোহের প্রকাশ বলে মনে করতেন। ফলে মাঝে মাঝে অন্য ধর্মের লোকেরা তাদের উপর অত্যাচার করত। সরকার এ ব্যাপারে অত্যন্ত উদাসীন থাকতেন। শুধু তাই নয়, **ভ্যালেরিয়ান, অলে।ময় ডায়োক্লিয়ান** প্রমুখ সম্রাটগণ রাজদ্রোহের অভিযোগে খৃষ্টানদের উপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।

সম্রাট কনস্টাইনটাইনের মনোভাবও প্রথমে খৃষ্টধর্মের অনুকূল ছিল না। পরে তিনি ঐ ধর্মকে স্বীকৃতি দিয়ে আইন পাশ করেন। ৩১৩ খৃষ্টাব্দে মিলান-এর ঘোষণাপত্রে কনস্টানটাইন তাই খৃষ্টধর্মের প্রতি সহিষ্ণু মনোভাব প্রদর্শন করে রাষ্ট্রের উপর এর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দিলেন। এখন থেকে সকল ধর্মের পুরোহিতদের সঙ্গে খৃষ্টান বিশপরাও রাজসভায় স্থান পেলেন। সরকারী কাজে খৃষ্টানদের নিয়োগে যে বাধা ছিল, তা তুলে নেওয়া হলো। সাধারণ প্রজাদের যে সব দায়িত্ব পালন করতে হতো, খৃষ্টান পুরোহিতদের সেগুলি থেকে রেহাই দেওয়া হলো। খৃষ্টান ভক্তদের মৃত্যুকালীন দানগ্রহণের এবং ক্রীতদাসদের মুক্তি দেওয়ার অধিকারও চার্চকে দেওয়া হলো। মৃত্যুর কিছুকাল আগে কনস্টানটাইন খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। সম্রাট কনস্টান-টাইনের নীতিই খৃষ্টধর্মের স্থায়িত্ব ও প্রসার সুনিশ্চিত করেছিল। এর ফলে কনস্টানটাইন জনসাধারণের বিপুল অংশের সহানুভূতি লাভ করেন।

এই সময় থেকে চার্চগুলিও রোমান সম্রাটের প্রতি সহানুভূতিশীল হয় এবং সাম্রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণ ও শ্রীবৃদ্ধির কাজে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। ক্রমান্বয়ে সমাজের উচ্চশ্রেণীর মানুষও খৃষ্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ঐ ধর্মমত গ্রহণ করে সমগ্র সমাজজীবনকে প্রভাবিত করে। বাইজান্টাইন সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এইভাবে খৃষ্টান চার্চগুলি তথা খৃষ্টধর্ম এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

রোমান সম্রাট জাস্টিনিয়ান ঃ বাইজান্টাইন সম্রাটদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলন সম্রাট জাস্টিনিয়ান। ৫২৭ খৃষ্টাব্দে যখন জাস্টিনিয়ান বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করলেন, তখন তাঁর বয়স চল্লিশ বছর। তিনি স্কুপির এক কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং নিজের সাহস, বুদ্ধি ও অবিরত চেষ্টার ফলে সম্রাট পদে উন্নীত হয়েছিলেন। সম্রাট জাস্টিনিয়ান একাধারে রাষ্ট্রশাসন, স্থাপত্য, ধর্ম, আইন, অর্থনীতি এবং সংগীতে বিশেষভাবে উৎসাহী ছিলেন। তিনি রোমান সাম্রাজ্যের গৌরব, মহত্ত্ব ও আদর্শ সম্বন্ধে এক সুমহান ধারণা পোষণ করতেন। জস্টিনিয়ান কঠোর হস্তে রাজ্য শাসন করে বর্বরজাতিগুলির আক্রমণ থেকে রোমান

সাম্রাজ্য রক্ষা করেন। তাঁর অন্যতম লক্ষ্য ছিল রোমান সাম্রাজ্য পশ্চিম সীমান্তে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, কিন্তু তিনি তাঁর এই কার্যক্রম রূপায়ণ করতে



সম্রাট জাস্টিনিয়ান ও সভাসদবর্গ

সক্ষম হননি। জাস্টিনিয়ানের শাসনকাল থেকেই বাইজান্টিয়ামের স্বর্ণ যুগ শুরু হয়।

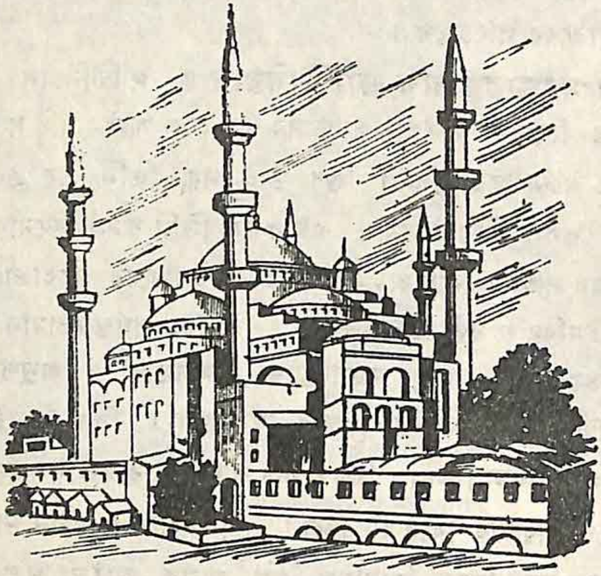
রাজ্যজয়ঃ জাস্টিনিয়ান ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। সম্রাট হয়েই তিনি উত্তর আফ্রিকার **ভ্যাণ্ডাল রাজ্য** আক্রমণ করেছিলেন এবং মাত্র দুটি যুদ্ধে তিনি ভ্যাণ্ডাল রাজ্য বিধ্বস্ত করেন। ভ্যাণ্ডাল রাজ্য জয় করার আগেই তিনি ইতালি আক্রমণ করে অতি অল্প সময়ের মধ্যে **নেপল্‌স, রোম** এবং **র‍্যাভেনা** অধিকার করেছিলেন। র‍্যাভেনা বিজয়ের মধ্য দিয়ে সমগ্র ইতালির উপর বাইজান্টাইন শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় (৫৫২ খৃঃ)।

বর্বর জাতিগুলি এবং হূণগণ জাস্টিনিয়ানকে পুনঃপুনঃ বাধা দিতে থাকে। ৫৫৯ খৃষ্টাব্দে **অ্যাভর ও শ্লাভগণ** কনস্টান্টিনোপল পর্যন্ত অগ্রসর হলে জাস্টিনিয়ানের সেনাপতি **বেলসারিয়াস** তাদের বিতাড়িত করেন। রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক প্রভুত্বলাভের আশায় জাস্টিনিয়ান **পারস্য দেশের**

বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। এই যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। প্রথম দিকে পারস্যের রাজা সামান্য সাফল্য লাভ করলেও ৫৫৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তিনি জাস্টিনিয়ানের নিকট পরাজয় স্বীকার করেন। পারস্যের বিরুদ্ধে অভিযান জাস্টিনিয়ানের অসাধারণ বীরত্বের পরিচায়ক।

আইন-সংস্কারকরূপে জাস্টিনিয়ান ঃ জাস্টিনিয়ান কেবলমাত্র বিজয়ী বীর হিসেবে ইতিহাস-খ্যাত নন, রোমান আইনবিধি সংকলন করে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি এর একটি সম্পূর্ণ ও সুসংবদ্ধ রূপও দিয়েছিলেন। এই কাজে তিনি কনস্টান্টিনোপলের শ্রেষ্ঠ আইনবিদদের সাহায্য নিয়েছিলেন। এই আইনজ্ঞদের পুরোভাগে ছিলেন বিখ্যাত আইনবিদ ও মন্ত্রী **ট্রিবোনিয়ান**। এতদিন পর্যন্ত রোমান আইন দুই অংশে বিভক্ত ছিল—(১) **সম্রাটদের শাসনতন্ত্র ও অনুশাসন** এবং (২) **পূর্ববর্তী আইনজ্ঞদের বিচার মীমাংসা**। কিন্তু আইনের এই উপাদানগুলি বিশৃঙ্খল ছিল। বিগত পাঁচ শতাব্দীর রাজকীয় অনুশাসনগুলি শোচনীয়রূপে পরস্পর বিরোধী ছিল। পৌত্তলিক ও খৃষ্টান ভাবধারাগুলি এই আইনের মধ্যে মিশে গিয়েছিল এবং অনেক আইন অপ্রচলিত হয়ে পড়েছিল। জাস্টিনিয়ান এই সব বিভ্রান্তি তিনটি গ্রন্থ প্রণয়ন করে দূর করলেন। ৫২৭ খৃষ্টাব্দে জাস্টিনিয়ান সিংহাসনারোহণের দু'বছরের মধ্যে সম্রাট **হাড্রিয়ান** থেকে জাস্টিনিয়ান পর্যন্ত সমস্ত আইন, একটি ভারপ্রাপ্ত কমিটি সুবিন্যস্ত ও সুসংবদ্ধ করে একটি খণ্ডে প্রকাশ করল। এটি **জাস্টিনিয়ান বিধিরূপে পরিচিত** এবং **প্রাচীন আইনজ্ঞদের সিদ্ধান্তের বাস্তব রূপ নামে চিহ্নিত**। আদালত ও আইন বিদ্যালয়ে এই গ্রন্থ নির্ধারিত বিধিরূপে পরিগণিত হওয়ায় আজও এটি যথেষ্ট সমাদৃত। এই প্রমাণ্য গ্রন্থে আইনের মৌল নীতিগুলির ধারাবিবরণী যুক্ত হওয়ায়, রোমান আইন সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা জন্মে। এগুলি রোমক আইনের ক্রোড়পত্ররূপে লিখিত হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্রীক ভাষাই ব্যবহার করা হয়েছে। যা হোক, আইনসংস্কারের মধ্য দিয়ে জাস্টিনিয়ানের প্রতিভাই প্রকাশিত হয়েছে এবং এর অসাধারণ গুরুত্ব পরবর্তিকালে অনুভূত হয়েছে।

শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকতা ঃ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বাইজান্টিয়ামে জাস্টিনিয়ানের শাসনকাল ছিল শিল্পকলার স্বর্ণযু । কতকগুলি দুর্গ তৈরী ছাড়াও জাস্টিনিয়ান বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের শহরগুলিকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে



সেণ্ট সোফিয়া গির্জা

চেয়েছিলেন। সেই সময় যেসব সৌধ নির্মিত হয়েছিলে তাদের মান অত্যন্ত উঁচু ছিল। বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যে স্থাপত্যের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত নিদর্শন ছিল **কনস্টান্টিনোপলের সেণ্ট সোফিয়া গির্জা**। এই গির্জার গম্বুজটি মানুষের বিস্ময় উদ্রেক করে। এর বিশালত্বে জনগণ অভিভূত হয়ে পড়ে। এটি নির্মাণ করতে ব্যয় হয়েছি কয়েক লক্ষ টাকা। জাস্টিনিয়ানের রাজত্বকালে চিত্রশিল্পেরও প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। **এল গ্রোকো** বাইজান্টিয়ামের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী ছিলেন। বাইজান্টিয়ামের স্বর্ণকারগণ অত্যন্ত সুন্দর সুন্দর অলংকার তৈরি করত। র‍্যাভেনাতে হাতীর দাঁতের কারুকার্য করা বহু নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়।

ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র রূপে বাইজান্টিয়ামের গুরুত্ব ঃ বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের প্রথম দিকে শান্তি বিরাজ করার ফলে, ব্যবসা-

বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। নতুন রাজধানী বাইজান্টিয়াম ক্রমান্বয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। সেই সময় পূর্বদিকেই ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান ঘাঁটি। সিরিয়াতে উৎকৃষ্ট রঙীন কাপড় উৎপন্ন হতো। এশিয়া মাইনর ও ইতালিতে উৎপন্ন হতো উৎকৃষ্ট মাদক দ্রব্য। ভৌগোলিক দিক দিয়ে বাইজান্টিয়াম এইসব দেশের নিকটে অবস্থিত ছিল। তাই ব্যবসা-বাণিজ্য বিস্তারের জন্য বাইজান্টিয়াম এর পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছিল। বাইজান্টিয়াম মিশর, আফ্রিকা ও রোমের বাণিজ্যকেও নিয়ন্ত্রণ করত। মিশর থেকে খাদ্য ও নানাপ্রকার পণ্য বাইজান্টিয়ামে আমদানি করা হতো। পূর্বদিকে জলপাই উৎপাদক অঞ্চল হতে আমদানি হতো ভোজ্য তৈল। লোহা, নানাপ্রকার ধাতু ও মাটির পাত্রও বাইজান্টিয়াম থেকে বাণিজ্যিক প্রয়োজনে পশ্চিমদিকে চালান যেত। ধাতুনির্মিত অস্ত্র-শস্ত্র বাইজান্টিয়ামে প্রভূত পরিমাণে তৈরি হতো। বাইজান্টিয়ামের অভিজাত শ্রেণী ও নাগরিকরা ধাতুনির্মিত বাসন ও মাটির বাসন ব্যবহার করত। পূর্বদিকের আমদানি করা বিলাস দ্রব্য বাইজান্টিয়ামে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে।

বাইজান্টিয়ামের সংস্কৃতি ঃ পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর পশ্চিম ইউরোপে যখন শিক্ষা-দীক্ষা ও সংস্কৃতি প্রায় লুপ্ত, সে সময় কনস্টান্টিনোপল ছিল গ্রীক ও রোমান সংস্কৃতির পীঠস্থান। ইউরোপের বহু পণ্ডিত এখানে গ্রীক ভাষা, সাহিত্য, দর্শন ও ধর্মগ্রন্থের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করতেন। বিজ্ঞানচর্চাও হতো ব্যাপকভাবে। রসায়ন ও জ্যোতির্বিদ্যার প্রধান কেন্দ্র ছিল আলেকজান্দ্রিয়া নগর। **হাইপাশিয়া** নামে এক বিদুষী মহিলা ছিলেন এ যুগের শ্রেষ্ঠ গণিতবিদ।

ভাষা ও সাহিত্য ঃ বাইজান্টিয়ামের অধিকাংশ জনগণ গ্রীক বা ল্যাটিন সভ্যতার অংশীদার ছিল না। রাইন নদীর পশ্চিমে ব্যাপক অঞ্চলের মানুষের ভাষা ছিল জার্মান। আফ্রিকার মূরগণ তাদের আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলত। উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিরা গ্রীক সাহিত্য অধ্যয়ন করতেন। পাণ্ডুলিপি নকল ও সংস্করণ করা ছাড়াও বাইজান্টিয়াম সাম্রাজ্যের পণ্ডিতগণ **বিশ্বকোষ** ও

অভিধান রচনা করতেন। বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যে উন্নত মানের ঐতিহাসিক রচনা, সাধকদের জীবনী, আইন ও ধর্মশাস্ত্র রচিত হয়েছিল। বাইজান্টিয়াম সম্রাটদের অনেকেই উচ্চশিক্ষিত ছিলেন এবং কৃষ্টিমূলক কাজে নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন। জাস্টিনিয়ানের রাজত্বের আগেই কনস্টান্টিনোপলে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। এখানে দর্শন, আইন, ব্যাকরণ, গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে পঠনপাঠন চলত। গ্রীক সাহিত্য চর্চার জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয়ে একত্রিশ জন অধ্যাপক ছিলেন।

বাইজান্টিয়াম সাম্রাজ্যের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দার্শনিক ছিলেন প্লাটিনাস। প্রোক্লাস ছিলেন অপর খ্যাতনামা দার্শনিক।

শিল্প-ভাস্কর্য ঃ বাইজান্টিয়ামে গ্রীক শিল্পীদের অনবদ্য শিল্প-ভাস্কর্য বর্বর উপজাতিদের দ্বারা লুণ্ঠিত হয়েছিল এবং গ্রাম ও শহরের আবর্জনার তলায় চাপা পড়ে গিয়েছিল। সেগুলির উদ্ধার করে সংস্কার করা হয়। প্রাচীন মনীষী ও কবিদের অতি মূল্যবান সাহিত্য ও দর্শনের পাণ্ডুলিপিগুলিও রক্ষা করার চেষ্টা করা হয়। স্থাপত্য শিল্পে বাইজান্টিয়ামের শিল্পীদের অবদান অতুলনীয়। এই সময় বহু মঠ ও গির্জা তৈরি করা হয়েছিল। বাইজান্টিয়ামের রাজমিস্ত্রীরা অট্টালিকা নির্মাণে অভূতপূর্ব দক্ষতা অর্জন করেছিল। এগুলির নির্মাণ-শৈলী আজও শিল্পরসিকদের মনের খোরাক জোগায়।

আইন-কানুন ঃ আইন রচনায় বাইজান্টিয়ামের অবদান ছিল অসামান্য। উচ্চশ্রেণীর রোমান নাগরিকগণ আইন পাঠে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। আইন পঠন-পাঠনের জন্য বহু বিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল। ভবিষ্যতের আইনজ্ঞগণ যাতে বিচারালয়ে ভাল সওয়াল করতে পারেন তার জন্য অলংকারশাস্ত্র পঠন-পাঠনের উপযোগী অনেক বিদ্যালয়ও স্থাপিত হয়েছিল। একজন যোগ্য আইনজ্ঞ প্রাদেশিক শাসনকর্তা অথবা মন্ত্রীর পদও অলংকৃত করতে পারতেন।

প্রাচীন সংস্কৃতির সংরক্ষণ ঃ পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর প্রায় হাজার বছর প্রাচীন রোমান ও গ্রীক শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য সযত্নে সংরক্ষণ করেছিল। বাইজান্টাইন থেকেই রোমান ও গ্রীক সাহিত্য, রোমের আইন-কানুন এবং স্থাপত্য ও চারুশিল্পের

ধারা পশ্চিম ইউরোপে নতুন করে প্রবাহিত হয়েছিল। এই কারণেই বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য বিশ্বের ইতিহাসে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে।

কালপঞ্জী

১. সম্রাট কনস্টানটাইনের রাজত্বকাল—৩০৬ খৃষ্টাব্দ থেকে ৩৩৭ খৃষ্টাব্দ।
২. সম্রাট জাস্টিনিয়ানের রাজত্বকাল – ৫২৭ খৃষ্টাব্দ থেকে ৫৬৫ খৃষ্টাব্দ।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন - - - - - - - - - - **এক নম্বর**

১. কনস্টান্টিনোপলের প্রতিষ্ঠাতা কে? ২. খৃষ্টধর্মকে রাজধর্মরূপে কে স্বীকৃতি দেন? ৩. মিলান-এর ঘোষণাপত্রটি কি? ৪. জাস্টিনিয়ান কত খৃষ্টাব্দে রোমের সম্রাট হন? ৫. রোমান আইন কার নির্দেশে বিধিবদ্ধ হয়? ৬. বাইজান্টিয়ামের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী কে ছিলেন?

শূন্যস্থান পূর্ণ কর :

ক. —— তীরে বাইজান্টিয়াম ছিল পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী।
খ. কনস্টান্টিনোপলের বর্তমান নাম ——।
গ. —— খৃষ্টাব্দে জাস্টিনিয়ান বাইজান্টাইনের সিংহাসনে আরোহণ করেন।
ঘ. বাইজান্টাইন স্থাপত্যের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নির্দশন ——।
ঙ. বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যে উল্লেখযোগ্য দার্শনিক ছিলেন ——।

নির্দেশক প্রশ্ন * * * * **তিন নম্বর**

১. পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী কোথায় ছিল? এখানে কোন্ সভ্যতা গড়ে উঠেছিল? [১+২]
২. বাইজান্টিয়ামের নাম কনস্টান্টিনোপল হলো কেন? এটি কোন্ সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল? [১+২]
৩. খৃষ্টধর্মকে রাজধর্মরূপে স্বীকৃতি দেওয়ার পরিণতি কি হয়েছিল? [৩]

৪. জাস্টিনিয়ান ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন কেন ? [৩]

৫. জাস্টিনিয়ানবিধি বলতে কি বুঝায় ? [৩]

৬ সেণ্ট সোফিয়া গির্জা কে নির্মাণ করেন ? এর বিশেষত্ব কি ? [১+২]

বিষয় বিন্যাসী প্রশ্ন ... **৯ নম্বর**

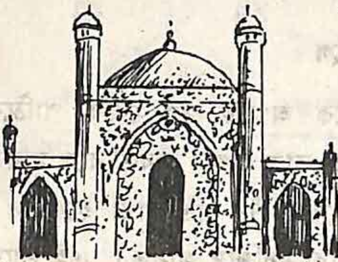
১. কনস্টাণ্টিনোপল শহরের প্রতিষ্ঠাতা কে ? এর বর্তমান নাম কি ? এখানে কোন্ সাম্রাজ্যের রাজধানী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল ? কনস্টাণ্টিনোপল শহরের ভোগোলিক গুরুত্ব কি ? [১+১+১+৬]

২. সম্রাট জাস্টিনিয়ান ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য কি ভাবে চেষ্টা করেছিলেন ? তাঁর সে প্রচেষ্টা সফল হয়েছিল কি ? [৭+২]

৩. জাস্টিনিয়ান রোমান আইন সংস্কার ও বিধিবদ্ধ করার জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন ? এর গুরুত্ব সংক্ষেপে বর্ণনা কর। [৬+৩]

৪. স্থাপত্য ও শিল্পকলার উন্নতির ক্ষেত্রে জাস্টিনিয়ানের কৃতিত্ব আলোচনা কর। [৯]

৫. ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্ররূপে বাইজাণ্টিয়ামের গুরুত্ব আলোচনা কর। [৯]



পঞ্চম অধ্যায়

ইসলাম ধর্ম ও তার প্রভাব

আরব ও তার জনগণ ঃ এশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে আরব দেশ। দেশটি মরুময় হওয়ায় কৃষিকাজের পক্ষে উপযোগী নহে। এই দেশে কয়েকটি মরূদ্যান নিয়ে মক্কা, মদিনা প্রভৃতি শহর গড়ে উঠেছে। এই সকল শহরের অধিবাসীরা ছিল ব্যবসায়ী। এরা মরূদ্যান বা ঝরনার ধারে অপেক্ষাকৃত ছায়াঘেরা জায়গায় বসতি স্থাপন করেছিল। এসব ব্যবসায়ী ছাড়া আরবে আর এক শ্রেণীর লোক ছিল তাদের বলা হতো বেদুইন। কিছু মাল-পত্র নিয়ে ব্যবসা করা, পশুপালন এবং অধিকাংশ সময় লুটতরাজ করে বেড়ানোই ছিল বেদুইনদের প্রধান উপজীবিকা। বেদুইনরা ছিল অত্যন্ত নির্ভীক ও স্বাধীনতাপ্রিয়। এদের মধ্যে কলহবিবাদ প্রায় লেগেই থাকত। কলহপ্রিয় আরবরা রুক্ষ ও হটকারী হলেও তারা ছিল অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ। তৎকালীন আরব সমাজে পৌত্তলিকতা, বহুবিবাহ প্রভৃতি কতকগুলি কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। নরহত্যা, মদ্যপান, জুয়াখেলা প্রভৃতি দুর্নীতি সেই যুগে আরবদের মধ্যে নিন্দনীয় ছিল না। আরবদের ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি সহজাত প্রীতি ছিল। তারা গান গাইতে এবং আবৃত্তি করতে ভালবাসত।

আরবদের সমাজ-জীবন ঃ আরবরা ছিল বহু উপজাতিতে বিভক্ত। সপ্তম শতকের শুরুতে আরবদের সমাজ বলতে বোঝাত উপজাতি সমাজ। এদের মধ্যে এক ধরনের অভিজাত শ্রেণীর উদ্ভব হয়। এই অভিজাতদের মধ্যে অনেকেরই বড় বড় পশুচারণ ক্ষেত্র এবং পশুর পাল ছিল। এদের মধ্য থেকেই নেতা বা সর্দার নির্বাচন করা হতো। প্রাচীন আরবেরা, নানা দেবদেবী, গাছ, পাথর ও মূর্তি পূজা করত। প্রতি গোষ্ঠীর নিজ নিজ দেবতা ছিল। জাতি হিসাবে একতাবদ্ধ না হলেও আরবরা ধর্মের দিক্ দিয়ে এক ছিল। তাদের ধর্মের কেন্দ্রস্থল ছিল মক্কা। এই মক্কা শহরেই ছিল কাবা নামে একটি মসজিদ। এই মসজিদটি ছিল ৪০ ফুট লম্বা, ৩৫ ফুট চওড়া এবং প্রায় ৫০ ফুট উঁচু। এই মসজিদের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একটি কৃষ্ণশিলা

আছে। অনেকের ধারণা এই পাথরখানাকে আল্লাহ স্বর্গ থেকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এই পাথরকে সব উপজাতির লোক প্রধান দেবতা বলে মানত ও ভক্তি করত। এই মসজিদে প্রায় ৩৬০টি দেবদেবীর মূর্তি রাখা হয়েছিল। তাই আরবের সব উপজাতির লোক মক্কার কাবা মসজিদে আসত। এই ভাবে মক্কা হয়ে উঠেছিল আরবদের সকলের মিলনের স্থান ও ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র। কাবা মসজিদের সন্নিকটে আরব কবিরা জমায়েত হয়ে মুল্লাকাত বা কবিতার লড়াই করত। হজরত মহম্মদের আবির্ভাবের আগে আরবদের মধ্যে কোন কেন্দ্রীয় সংগঠন বা প্রশাসন বলতে কিছুই ছিল না। প্রতিটি উপজাতি গোষ্ঠী ছিল স্ব স্ব প্রধান। আরবেরা ব্যক্তিস্বাধীনতায় ও গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিল। আরবদের মধ্যে বিদ্যাচর্চার প্রচলন ছিল। এই ছিল আরবদের সমাজ-জীবনের মোটামুটি পরিচয়।

আরব দেশ ও জাতির এরূপ সংকটময় কালে হজরত মহম্মদ এক নতুন ধর্মমত প্রচার করে আরবদের ঐক্যবদ্ধ করে, তাদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করেন।

হজরত মহম্মদ (৫৭০-৬৩২ খৃঃ): হর্ষবর্ধনের সমকালে আরবে ইসলাম ধর্ম প্রথম প্রচারিত হয়। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদ আরবের সুবিখ্যাত কোরেশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আবদুল্লাহ ছিলেন মক্কার অধিবাসী মাতা আমিনা মদিনার অধিবাসিনী। মহম্মদের জন্মের কয়েক মাস আগেই তাঁর পিতার মৃত্যু হয় এবং তাঁর ছ'বছর বয়সের সময় মা আমিনাও মারা যান। তখন পিতৃব্য আবুতালিয়েবের আশ্রয়ে মরুভূমিতে উঠ ও মেষপালক রূপে মহম্মদ জীবন আরম্ভ করেন।

কিশোর বয়স থেকেই তিনি আরব বণিকদের সঙ্গে মিশর, আবিসিনিয়া, সিরিয়া, পারস্য প্রভৃতি দেশে যাতায়াত করায়, নানা ধর্ম ও নানা জাতির সঙ্গে তাঁর মেলামেশার সুযোগ হয়েছিল। আরব দেশ তখন পৌত্তলিকতার লীলাভূমি, তার উপর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রায় সর্বদাই ধর্মকলহে লিপ্ত থাকত। মহম্মদ তাঁদের ধর্মের রীতিনীতি বিচার করে তাঁদের মধ্যে যে সব কুসংস্কার ছিল তা দূর করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

পঁচিশ বছর বয়সে হজরত মহম্মদ খাদিজা নামে এক পুণ্যবতী ও ধনী মহিলাকে বিবাহ করেন। এই বিবাহে মক্কার সম্ভ্রান্ত সমাজে মহম্মদের মর্যাদা বেড়ে যায়। চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত মহম্মদ মক্কার এক বিশিষ্ট ব্যবসায়ী রূপে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু পারিবারিক সুখ ঐশ্বর্য মহম্মদের মনে শান্তি দিতে পারে নি। তিনি প্রায়ই নির্জন মরুভূমিতে আল্লাহ-র ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। মক্কার অদূরে হেরা নামক এক পাহাড়ের নির্জন গুহায় মহম্মদ প্রায় পনর বছর গভীর তপস্যায় নিমগ্ন ছিলেন। ঐ সময় তিনি একদিন রাত্রে ঈশ্বরের বাণী শুনতে পান। কথিত আছে, স্বর্গের দূত মহম্মদের কাছে আল্লাহ-র বাণী নিয়ে আসেন এবং তা প্রচারের জন্য তাঁকে নির্দেশ দেন। সেই থেকে মহম্মদ 'পয়গম্বর' নামে পরিচিত হন।

মহম্মদ প্রবর্তিত ধর্মের নাম **ইসলাম**। ইসলাম ধর্মগ্রন্থের নাম কোরান। আল্লাহ্ এক, মহম্মদ আল্লাহ্-র প্রেরিত পুরুষ'—এই হচ্ছে ইসলামের মূলতন্ত্র। মুসলিমগণ একেশ্বরবাদী। কোরানে মুসলিমদের পাঁচটি বিধান মেনে চলবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন—**ইমান** (ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস), **নমাজ** (উপাসনা), **রোজা** (উপবাস), **জাকাত** (দরিদ্র সেবা), এবং **হজ** (মক্কার তীর্থ ভ্রমণ)। মুসলমানরা বিশ্বাস করেন যে, কোরান অভ্রান্ত, ইসলাম পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং মহম্মদ আল্লাহ্-র শ্রেষ্ঠ নবী বা বাণীবাহক। মহম্মদের পরে আর কোন নবী বা ধর্মপ্রচারক পৃথিবীতে আসবেন না। মুসলমানগণ পুনর্জন্ম এবং জন্মান্তর বিশ্বাস করেন না।

ধর্মপ্রচারক রূপে হজরত মহম্মদ ঃ হজরত মহম্মদের বয়স যখন চল্লিশ বছর তখন তিনি মক্কা শহরে ধর্মপ্রচারক রূপে আবির্ভূত হলেন। তাঁর প্রবর্তিত ধর্মমত গ্রহণ করলেন তাঁর স্ত্রী খাদিজা ও পরিবারের অন্যান্য লোকজন। অল্পদিনের মধ্যে বেশ কিছু লোক তাঁর ধর্মমত গ্রহণ করলে, তিনি প্রচলিত পৌত্তলিক মতবাদের বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করেন।

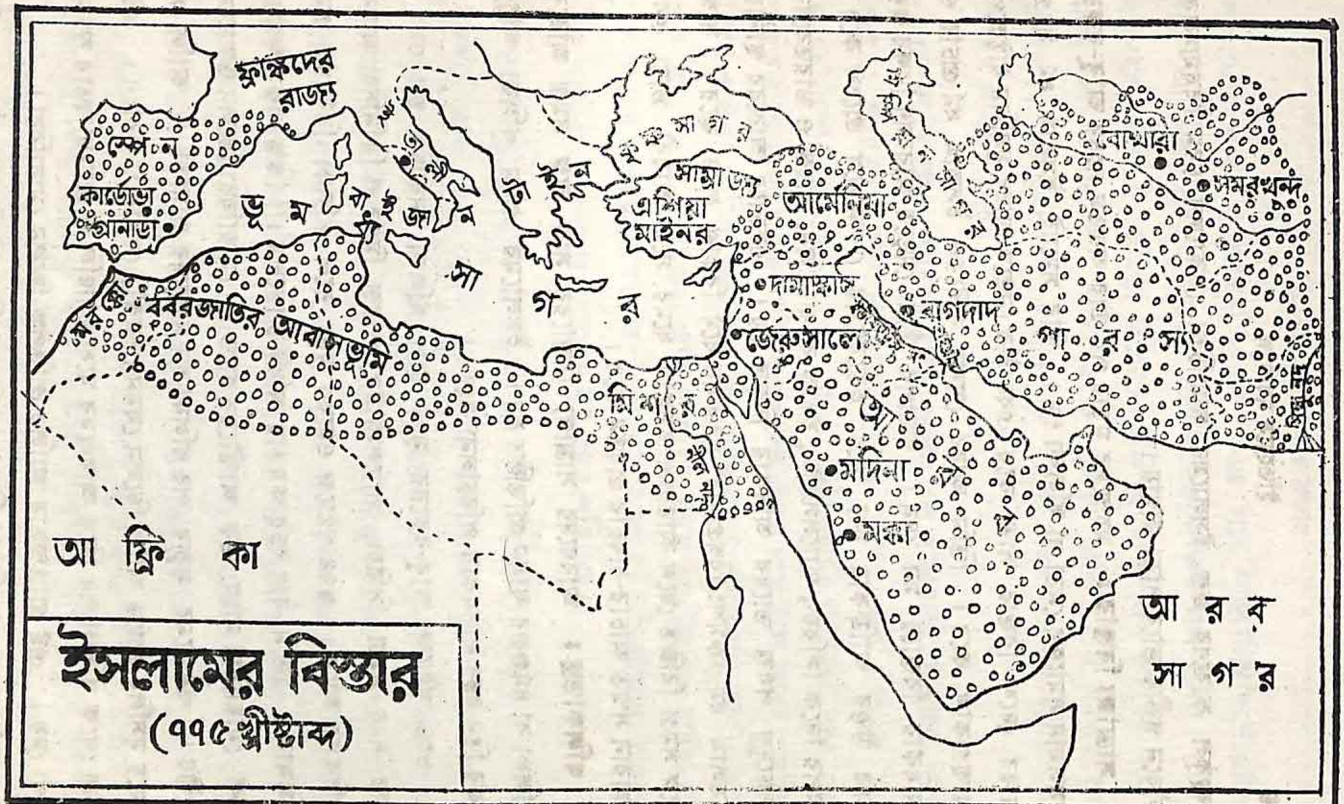
পৌত্তলিকতা ও বহু ঈশ্বরের দেশে এক ঈশ্বর বা আল্লাহ্-র অস্তিত্ব ঘোষণা করায় মহম্মদ তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হলেন। এমন কি তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করা হলো। অবস্থার গুরুত্ব বুঝতে পেরে মহম্মদ মক্কা

ত্যাগ করে মদিনায় গেলেন। মহম্মদের অনুগামীদের মধ্যে ছিলেন তাঁর প্রিয়শিষ্য **আবু-বকর**।

মহম্মদ মক্কা ত্যাগ করেন ৬২২ খৃষ্টাব্দে। মহম্মদের মদিনা যাওয়ার দিন থেকে তাঁর অনুগামীরা একটি বছর গণনা শুরু করেন। এর নাম **হিজরী সন**। মহম্মদ মদিনায় তাঁর ধর্মমত প্রচার করতে আরম্ভ করলেন। মদিনার মানুষ দলে দলে মহম্মদের ধর্মমত গ্রহণ করতে লাগল। অল্পদিনের মধ্যেই মহম্মদ এক বিশাল গোষ্ঠীর নেতারূপে স্বীকৃত হলেন।

মক্কা মদিনার যুদ্ধ ও তার ফলাফল ঃ হজরত মহম্মদের বিরুদ্ধে মক্কার অধিবাসীরা মদিনা আক্রমণ করল। কিছুকাল যুদ্ধ চলার পর মহম্মদ তাঁর অনুগামীদের নিয়ে মক্কা আক্রমণের জন্য অগ্রসর হলেন। মক্কাবাসীরা ভীত হয়ে পরাজয় স্বীকার করল। ৬৩০ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ পুনরায় মক্কায় প্রবেশ করলেন। পরম দয়ালু মহম্মদ মক্কাবাসীদের ক্ষমা করেন এবং তাদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হবার জন্য উপদেশ দেন। মক্কাবাসীরা মহম্মদের ধর্মমত গ্রহণ করে। কাবাশরিফের পবিত্র পাথরখানা ছাড়া আর সব দেবদেবীর মূর্তি ভেঙ্গে ফেলা হলো। মক্কাবাসী 'আল্লাতালা'কে একমাত্র ঈশ্বর বলে মেনে নিল। এই ঘটনার অল্পকাল পরেই মহম্মদের মৃত্যু হয় (৬৩২ খৃঃ)।

ইসলাম ধর্ম প্রসারের কারণ ঃ হজরত মহম্মদের ধর্মমত আরবদের মধ্যে এমন এক শক্তি ও অনুপ্রেরণার সঞ্চার করেছিল যে, অল্পকালের মধ্যে ইসলাম মধ্যযুগের অন্যতম প্রধান ধর্মে পরিণত হলো। ইসলামের এই দ্রুত প্রসারের পেছনে অনেকগুলি কারণ ছিল। যেমন—(১) ইসলাম ধর্ম মানুষের মধ্যে সাম্যের উদ্ভব ও নতুন আশার আলো সঞ্চার করতে পেরেছিল। (২) ইসলামের একেশ্বরবাদ ও সহজ সরল আচরণ এবং অনুষ্ঠানবিধি সাধারণ মানুষের পক্ষে পালন করা সুবিধাজনক ছিল। (৩) হজরত মহম্মদ তাঁর অনুগামীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তাঁর মৃত্যুর পর কেউ যেন তাঁকে আল্লাহ্-র প্রতিনিধিরূপে পূজা করার চেষ্টা না করে। মহম্মদের এই নিরাসক্ত মনোভাব তাঁকে অনেক বেশী জনপ্রিয় করে তোলে। এই সব



ইসলামের বিস্তার
(৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দ)

অনুকূল কারণের জন্য ইসলামের সাম্যচিন্তা সেকালের চরম বৈষম্যমূলক জীবনে গভীর ভাবে সাড়া জাগায়।

সাম্রাজ্য বিস্তার ঃ মহম্মদের মৃত্যুর পর তাঁর অন্যতম সহচর **আবু-বকর** মুসলমান সমাজের নেতা বা **খলিফা** হন। তাঁর সময়েই ইসলাম ধর্ম সমগ্র আরব দেশে বিস্তার লাভ করে এবং তাঁর নেতৃত্বে আরব মুসলিম রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে। তিনি আরব দেশের বাইরেও ইসলাম ধর্ম প্রচার ও অধিকার বিস্তারে মন দেন। অতঃপর তাঁর নেতৃত্বে আরবগণ মিশর জয় করে উত্তর আফ্রিকার মধ্য দিয়ে, ইউরোপের স্পেনদেশে প্রবেশ করে। অপর দিকে সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, ইরাক বা ব্যাবলিন, পারস্য ও ভারতবর্ষের সিন্ধুদেশ পর্যন্ত তাদের অধিকার বিস্তৃত হয়। এইভাবে আরবের স্থানীয় ইসলাম ধর্ম ক্রমশঃ বিশ্বপ্রসারী সর্বজনীন ধর্মে বিকাশ লাভ করে। সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বিজিত দেশে আরবগণ ইসলাম ধর্মের সঙ্গে আরবী ভাষা এবং কোরান সম্মত আচার-ব্যবহার প্রবর্তন করে।

খলিফাতন্ত্র ঃ আরবদের সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র আরবে খলিফা বা ধর্মগুরুর শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলামের প্রথম খলিফা আবু-বকর তিন বছর শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

৬৩৪ খৃষ্টাব্দে আবু-বকরের মৃত্যু হলে খলিফা নির্বাচিত হন ওমর। তাঁর সময় সমগ্র সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, পারস্য, মিশর ও ফিনিসিয়া আরব অধিকারে আসে। ৬৪৪ খৃষ্টাব্দে ওমরের মৃত্যু হলে খলিফা নির্বাচিত হন **ওসমান**। তিনি, বার বছর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা ছিল মোয়াবিয়া নামে এক আত্মীয়ের হাতে। মোয়াবিয়া ছিলেন উম্মায়েদ বংশীয়। ওসমানের মৃত্যুর পর খলিফা হন মহম্মদের জামাতা। **আলি** সে সময়ে মুসলিম জগতে আলি ছিলেন যেমন তেজস্বী, তেমনি ধর্মপরায়ণ। এই সময় থেকে খলিফা পদ নিয়ে আরবদের মধ্যে দলাদলি ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূচনা দেখা দেয়। এই প্রতিদ্বন্দ্বতায় আলির প্রতিপক্ষ ছিলেন মোয়াবিয়া।

আলি ও মোয়াবিয়ার বিরোধ গৃহযুদ্ধে পরিণত হলে ৬৬১ খৃষ্টাব্দে আলি নিহত হন। উম্মায়েদ গোষ্ঠীর খলিফারা ৬৬২ থেকে ৭৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত আরব

সাম্রাজ্যের শাসন পরিচালনা করেন। এর পরে **আব্বাসিদ বংশ** খলিফা পদে অধিষ্ঠিত হয়। এই বংশের শ্রেষ্ঠ খলিফা **হারুন-অল-রসিদ**। তিনি বাগদাদে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। খলিফা হারুন-অল-রসিদের দান ও মহত্ত্ব ছিল অসাধারণ। প্রজাদের সুখ-দুঃখের প্রতি তিনি সর্বদাই লক্ষ্য রাখতেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শিল্পে বাগদাদ তখন খ্যাতির উচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত ছিল।

স্পেন বিজয়ঃ আরবরা স্পেন দেশেও এক শক্তিশালী সাম্রাজ্য স্থাপন করে। উম্মায়েদ খলিফাদের আমলে ৭২১ খৃষ্টাব্দে এক বিশাল আরব বাহিনী স্পেন আক্রমণ করে। তারা ভিসিগথদের পরাজিত করে স্পেন অধিকার করে নেয়। এই ঘটনার পর দেশ জয়ের সঙ্গে সঙ্গে আরব, সিরিয়া, মিশর ও উত্তর আফ্রিকা হতে দলে দলে মুসলমান স্পেনে বসতি স্থাপন করতে শুরু করে। ৭৫৬ খৃষ্টাব্দে আবদুর রহমান নামে এক উম্মায়েদ বংশীয় যুবক স্পেনে এসে মুসলমান রাজ্যের সিংহাসনে বসেন। এই রাজ্যের রাজধানী ছিল কর্ডোবা। স্পেনের আরবগণ **মূর** নামে পরিচিত।

কর্ডোবাঃ স্পেনের রাজধানী কর্ডোবা ইসলামী সংস্কৃতির অন্যতম পীঠস্থান রূপে গড়ে ওঠে। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয় ছিল বিশ্ববিখ্যাত। দেশ-বিদেশের ছাত্র ও পণ্ডিতরা বিদ্যাচর্চার জন্য এখানে মিলিত হতেন। এখানকার জ্ঞানী-গুণীরা অন্যান্য ইসলামী সংস্কৃতি কেন্দ্রের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন। কর্ডোবার ২৭টি উচ্চ শিক্ষাকেন্দ্রের বিপুল খ্যাতি ছিল। এখানকার অসংখ্য গ্রন্থাগারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল রাজবাড়ির গ্রন্থাগার। কর্ডোবা ছাড়াও স্পেনের **শেভিল, টলেডো ও গ্রাণাডা** প্রভৃতি প্রদেশে ইসলাম ধর্ম, আরবী ভাষা ও রীতিনীতির নিয়মিত চর্চা হতো।

শিল্প ও স্থাপত্যের দিক দিয়েও কর্ডোবা খুবই উন্নত ছিল। এখানে তিন হাজারের বেশী মসজিদ, আশি হাজার দোকান, আট হাজার অট্টালিকা এবং সর্বসাধারণের জন্য ন'শ স্নানাগার ছিল। কর্ডোবার নিকটেই অবস্থিত ছিল চার হাজার স্তম্ভ ও পনেরো হাজার দরজাবিশিষ্ট **জহরা প্রাসাদ**।

প্রাসাদের অভ্যন্তরে নির্মিত পারার হ্রদের উপরে সূর্যকিরণ পড়লে সমস্ত প্রাসাদটি আলোকে ঝলমল করে উঠতো।

ইউরোপে মুসলিম আক্রমণের প্রতিক্রিয়াঃ মুসলিম আক্রমণের বিরুদ্ধে ইউরোপীয়দের প্রথমে ছিল আত্মরক্ষার ভূমিকা। এশিয়া মাইনর এবং ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপগুলিসহ দক্ষিণ ইতালি মুসলমানদের পদানত হয়। স্পেনের ভিতর দিয়ে আরবীয়গণ পীরেনীজ পর্বত অতিক্রম করে উত্তর দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করলে ফাঙ্ক জাতির সেনাপতি **চার্লস মার্টেল** টুরসের যুদ্ধে তাদের পরাস্ত করেন। একাদশ শতকে মুসলমানগণ নিজেদের মধ্যে বিরোধের ফলে খানিকটা দুর্বল হয়ে পড়ে। সেই সময় পোপের আহ্বানে খৃষ্টান জাতিগুলি তাদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ শুরু করে। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে মুসলমানদের সঙ্গে শত্রুতা থাকলেও তাদের উন্নত সংস্কৃতির প্রতি ইউরোপীয়দের কোন অশ্রদ্ধা ছিল না। আরব জাতির কাছ থেকে বিবিধ জ্ঞান আহরণ করে তারা নিজেদের সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করে তোলে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আরবদের অবদানঃ আরবগণ যে কেবল বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল তা নয়, আরবীয় পণ্ডিতগণ দেশ-বিদেশ থেকে জ্ঞান আহরণ করে নিজেদের দেশকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। আরবীয়রা মধ্য প্রাচ্যের লোক। তাদের সাম্রাজ্যের পূর্বদিকে পারসীক, ভারতীয় ও চীন সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল। তাই আরবীয়দের পক্ষে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বহু উপকরণ সংগ্রহ করা সহজ হয়েছিল। আরবীয় পণ্ডিতরা ভারতের কাছ থেকে প্রথমে 'শূন্য' সংখ্যার ব্যবহার শেখে। ফলে, গণিতের জগতে এক যুগান্তকারী বিপ্লব ঘটে যায়। জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে ভারতের অবদানের কথা আরবের মাধ্যমে ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। বীজগণিত আরবদেরই আবিষ্কার। আরবীয় পণ্ডিতরা ফলিত রসায়নের চর্চা করতেন। তাঁদের এই বিদ্যার নাম **অ্যালকেমি**। চিকিৎসা শাস্ত্রে মনীষী **ইবন্ সিনা**-র সুগভীর পাণ্ডিত্য সারা বিশ্বে স্বীকৃতি পেয়েছিল। **অ্যালকিন্দি** নামক জনৈক পণ্ডিত দর্শন, গণিত, জ্যোতিষ, চিকিৎসা-শাস্ত্র,

সংগীত প্রভৃতি বিষয়ে প্রায় দু'শ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। **ইবনে ঈশাখ** নামে বিখ্যাত চিকিৎসক প্রাচীন গ্রীকদের চিকিৎসা শাস্ত্রের সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। কোরানের উপর টীকা এবং আরবী ভাষায় কালানুক্রমিক ইতিহাস রচনা করে **অ্যালতিবারি** বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। **ইবন্ খালদুন** ছিলেন অপর একজন খ্যাতনামা ঐতিহাসিক। আরবীয় পর্যটকদের মধ্যে **আল্‌বেরুণীর** নাম প্রসিদ্ধ। তাঁর রচিত **কিতাব-উল হিন্দ** গ্রন্থ থেকে তৎকালীন হিন্দুদের আচার-ব্যবহার, আইন-কানুন, ধর্ম-সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে বহু তথ্য জানা যায়। **শাহ্‌নামা** রচয়িতা **কবি ফিরদৌসী** এবং ওমর খৈয়ামের সুবিখ্যাত রুবাইৎগুলি আরবদের সাহিত্য প্রতিভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

স্থাপত্য বিদ্যায় আরবদের অবদানের চিহ্ন ইসলামী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে আছে। বাগদাদ, সমরখন্দ, কায়রো ও কর্ডোবা প্রভৃতি স্থানে আরব স্থাপত্য-শিল্পের নানা নিদর্শন আজও বিদ্যমান।

কালপঞ্জী

হজরত মহম্মদের জন্ম—৫৭০ খৃষ্টাব্দ। মহম্মদের মক্কাবিজয়—৬৩০ খৃষ্টাব্দ। হজরত মহম্মদের মৃত্যু -৬৩২ খৃষ্টাব্দ। আলির খলিফা পদ গ্রহণ—৬৫৬ খৃষ্টাব্দ। উম্মায়েদ খলিফাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা—৬৬২ খৃষ্টাব্দ।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন -------------------- **এক নম্বর**

১. আরব দেশটি কোথায় অবস্থিত? ২. বেদুইন কাদের বলা হয়? ৩. হজরত মহম্মদ কোথায় কত খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন? ৪. কোরান কি? ৫. ইসলামে প্রথম খলিফা কে? ৬. হারুন-অল-রসিদ কে ছিলেন? ৭. কার্ডোবা কোথায় অবস্থিত? ৮. শূন্য সংখ্যার ব্যবহার আরবীয়রা কাদের কাছ থেকে শিখেছিল? ৯. 'অ্যালকেমি', কথাটির অর্থ কি?

নির্দেশক প্রশ্ন * * * * **তিন নম্বর**

১. ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক কে ? এই ধর্মের মূল কথা কি ? [১+২]
২. হজরত মহম্মদ কেন মদিনায় গিয়েছিলেন ? [৩]
৩. মক্কা ও মদিনার যুদ্ধের ফল কি হয়েছিল ? [৩]
৪. হিজরী সন কখন থেকে গণনা করা শুরু হয় ? [৩]
৫ খলিফা কাদের বলে ? ইসলামের প্রথম খলিফা কে ? [১+২]
৬ চিকিৎসা শাস্ত্রে প্রখ্যাত আরবীয় পণ্ডিত কে ছিলেন ? [৩]
৭. অ্যালবিরুনী কে ছিলেন ? তিনি কি জন্য খ্যাতিলাভ করেছিলেন ? [১+৩]

রচনাত্মক প্রশ্ন * * * * * * * **৯নম্বর**

১. হজরত মহম্মদ কে ছিলেন ? তাঁর জীবন ও বাণী সংক্ষেপে আলোচনা কর। [৯]
২. মক্কাবাসীরা হজরত মহম্মদের উপর বিরূপভাজন হয়েছিল কেন ? [৯]
৩. আরবদের সাম্রাজ্য বিস্তার কাহিনী সংক্ষেপে আলোচনা কর। (৩)
৪. খলিফাতন্ত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনা কর ; [৩+৫]
৫. সভ্যতার ইতিহাসে ইসলামী সংস্কৃতির প্রভাব বর্ণনা কর। [৯]
৬. ইসলামী সংস্কৃতি প্রসারে কর্ডোবার অবদান সংক্ষেপে আলোচনা কর। [৯]
৭. মুসলিম আক্রমণে ইউরোপে কি প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল ? [৯]

বিষয়মুখী প্রশ্ন * * * * * * * **১নম্বর**

শূন্যস্থানে উপযুক্ত শব্দ বসাও :

(ক) মহম্মদ প্রবর্তিত ধর্মের নাম ——। [১]
(খ) মহম্মদের মৃত্যুর পর —— মুসলিম সমাজের খলিফা হন। [১]
(গ) আব্বাসিদ বংশের শ্রেষ্ঠ খলিফা ——। [১]
(ঘ) স্পেনের রাজধানী —— ইসলামী সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র ছিল। [১]
(ঙ) আরবীয় পণ্ডিতেরা ফলিত রসায়নের চর্চা করতেন। এই বিদ্যার নাম —। [১]



ষষ্ঠ অধ্যায়

মধ্যযুগে পশ্চিমী ইউরোপ

পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের ধ্বংসের সমকালে 'ফ্রাঙ্ক' নামে এক বর্বর জাতিসমূহের এক গোষ্ঠী বর্তমান ফ্রান্স ও জার্মানীর কিয়দংশ নিয়ে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। এই ফ্রাঙ্ক রাজ্যে শাসন করেছিলেন **মেরোভিঞ্জিয়ান** নামে এক রাজবংশ। এই বংশীয় রাজারা দুর্বল হয়ে পড়লে, পিপিন নামে এক রাজকর্মচারী শাসনক্ষমতা কেড়ে নিয়ে রাজা হন।

রাজা পিপিনের দুই ছেলে—**কার্লোমান ও চার্লস**। মৃত্যুকালে পিপিন তাঁর দুই ছেলের মধ্যে রাজ্য ভাগ করে দেন। ৭৭১ খৃষ্টাব্দে কার্লোমান মারা গেলে চার্লস রাজ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। এই চার্লসই ইতিহাসে শার্লেমান নামে পরিচিত।

শার্লেমান ঃ শার্লেমান ফ্রাঙ্ক রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। পরে এই বংশ **ক্যারোলিঞ্জিয়ান** বংশ নামে পরিচিত হয়। শার্লেমান ছিলেন সুপুরুষ, দীর্ঘাকৃতি এবং অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন।

পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর ইউরোপের সর্বত্র যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছিল, তা দূর করে শান্তি ও শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে শার্লেমান কৃতসংকল্প হয়েছিলেন। পুনঃ পুনঃ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যুদ্ধযাত্রা করে শার্লেমান বর্তমান ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড, স্পেন ও ইতালির উত্তরাংশ এবং জার্মানির অধিকাংশ অঞ্চল নিয়ে ফ্রাঙ্ক সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন।

জীবনের অধিকাংশ সময় শার্লেমানের যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে কেটেছে। তাঁর সিংহাসন আরোহণের অল্পকালের মধ্যে লম্বার্ডগণ বার বার অভিযান করে ইতালিতে ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল। লম্বার্ড রাজ ডেসিডেরিয়াস রোমের দিকে অগ্রসর হলে রোমানগণ নিরুপায় হয়ে শার্লেমানকে রোম রক্ষার জন্য আবেদন জানায়। শার্লেমান এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে সসৈন্যে লম্বার্ডদের দমনে অগ্রসর হলেন। তিনি লম্বার্ডদের পরাজিত করে তাদের সিংহাসন

অধিকার করলেন। জার্মানির উত্তর-পশ্চিমে বসবাসকারী স্যাক্সনদের সঙ্গেও শার্লেমান দীর্ঘদীন যুদ্ধ করেছেন। স্যাক্সনরা খৃষ্টধর্মাবলম্বী ছিল না। তারা খৃষ্টান যাজকদের প্রতি ভয়ানক অত্যাচার করত। এরা গির্জা বা ভজনালয় পুড়িয়ে দিত, এমন কি যাজকদের হত্যা করতেও কুণ্ঠিত হতো না। তারা শার্লেমানের কাছে পরাজিত হলেও একেবারে শক্তিহীন হয়নি। সুযোগ পেলেই তারা শার্লেমানকে আক্রমণ করত।

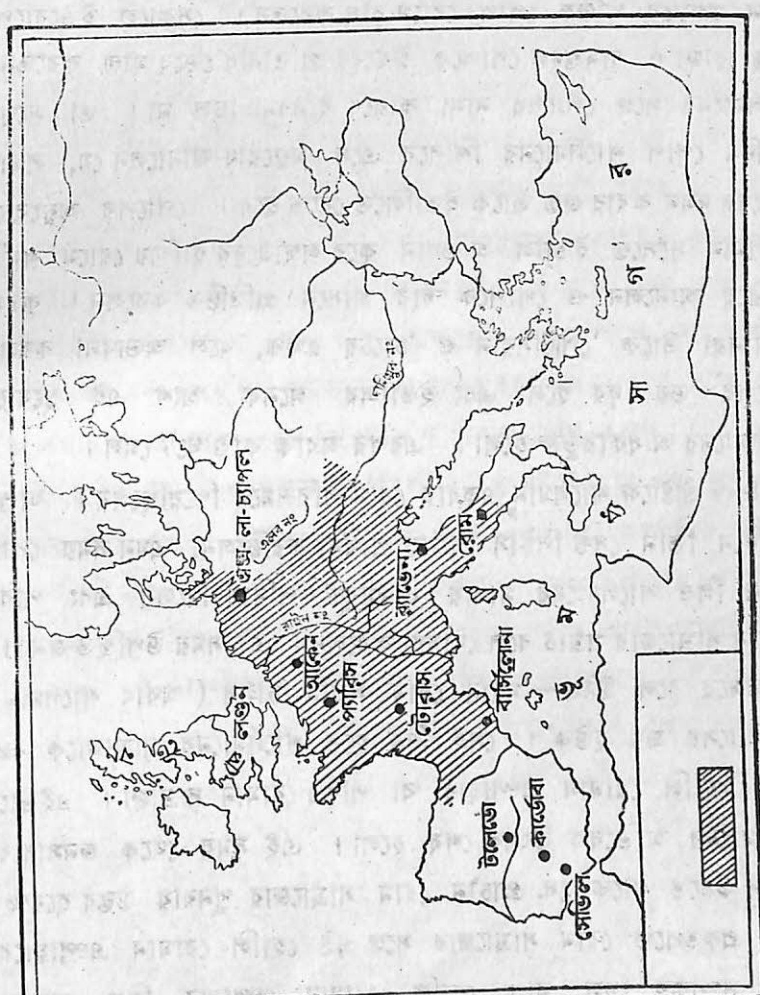


শার্লেমান

শেষ পর্যন্ত শার্লেমান তাদের পরাজিত করে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করেছিলেন। একদিনে তিন চার হাজার স্যাক্সন-বন্দীদের প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। এরপর থেকে স্যাক্সনরা আর শার্লেমানের বিরুদ্ধাচরণ করতে সাহসী হয়নি। অবশেষে স্যাক্সনরা খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। শামের্লান স্যাক্সন এলাকায় রাস্তাঘাট, গির্জা, সেতু ইত্যাদি তৈরি এবং পাদরী প্রেরণ করে খৃষ্টধর্মের প্রভাব বৃদ্ধির চেষ্টা করেন।

এই সময় স্পেন দেশে আরবদের মধ্যে গৃহবিবাদ শুরু হয়। সেখানকার শাসক সুলতান আবদুল রহমানের সঙ্গে দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মতবিরোধের সৃষ্টি হয়। অতঃপর তাঁরা শার্লেমানকে স্পেন আক্রমণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানান। শার্লেমানও কালবিলম্ব না করে সসৈন্যে

স্পেন অভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করলেন। তিনি স্পেন যুদ্ধে ব্যস্ত থাকা কালে সংবাদ পেলেন যে, স্যাক্সনরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। এই বিদ্রোহ দমনের জন্য তিনি যখন অগ্রসর হচ্ছিলেন, তখন পথিমধ্যে তাঁকে আরবরা



আক্রমণ করে। এই যুদ্ধে শার্লেমানের ভাইপো রোল্যাণ্ড অসীম বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করে মৃত্যু বরণ করেন। আরবীয়দের সঙ্গে রোল্যাণ্ডের যুদ্ধ এবং তাঁর বীরত্ব কাহিনী নিয়ে 'সঙ্ অব রোল্যাণ্ড' বা রোল্যাণ্ড গীতি রচিত

হয়েছিল। মধ্যযুগের চারণগণ এই গীতি গ্রামে গ্রামে গেয়ে বেড়াত। এরপর থেকে শার্লেমানের প্রভাব-প্রতিপত্তি সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে।

শার্লেমানের অভিষেক ও পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঃ খৃষ্টান জগতের ধর্মগুরু পোপ রোমে বাস করতেন। সেকালে ইউরোপের সমস্ত রাজা ও সামন্তদল পোপকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি ভেবে মান্য করতেন। শার্লেমানের সঙ্গে পোপের নানা কারণে বনিবনা ছিল না। তা সত্ত্বেও একদিন পোপ শার্লেমানের শিবিরে এসে অনুরোধ জানালেন যে, লম্বার্ড শত্রুদের দমন করার জন্য তাঁকে ইতালিতে যেতে হবে। পোপের অনুরোধে শার্লেমান সসৈন্যে ইতালি অভিযান করে লম্বার্ডদের হারিয়ে রোমে শান্তি ফিরিয়ে আনলেন ও পোপকে তাঁর আসনে প্রতিষ্ঠিত করলেন। কৃতজ্ঞ রোমানরা তাঁকে 'পেট্রিসিয়ান' ও 'চার্চের রক্ষক, বলে অভ্যর্থনা করল। পোপের ভয় দূর হলো এবং ইতালির অনেক অংশ এই সুযোগে শার্লেমানের অধিকারভুক্ত হলো। এরপর অবাক কাণ্ড ঘটে গেল।

৮০০ খ্রীষ্টাব্দে শার্লেমান একবার রোম পরিভ্রমণে গিয়েছিলেন। যীশুর জন্মদিনে তিনি সেন্ট পিটার্স গির্জায় প্রার্থনা করছিলেন, এমন সময় পোপ তৃতীয় লিও শার্লেমানের মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিলেন এবং পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট বলে ঘোষণা করলেন। এই সময় উপস্থিত জনতাও উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠল—'মহান রোম সম্রাট চার্লস (অর্থাৎ শার্লেমান) অগাস্টাসের জয় হউক'। সেই দিন হতে শার্লেমানের সাম্রাজ্যকে বলা হতো 'হোলি রোমান এম্পায়ার' বা পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য। এইভাবে শার্লেমানের অভিষেক উৎসব শেষ হলো। এই সময় থেকে জনসাধারণ বিশ্বাস করতে থাকে যে, প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের পুনরায় উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রোম সাম্রাজ্যের সঙ্গে এই হোলি রোমান এম্পায়ারের কোন সম্পর্কই ছিল না। হোলি রোমান এম্পায়ার ছিল ফ্রাঙ্কদের প্রতিষ্ঠিত একটি নতুন সাম্রাজ্য।

শার্লেমানের অভিষেক উৎসবের গুরুত্ব ঃ শার্লেমানের অভিষেক উৎসবের গুরুত্ব অপরিসীম। তাঁর রাজকীয় অভিষেকের মধ্য দিয়ে

মধ্যযুগের ইতিহাসের কয়েকটি ঘটনা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়। যেমন, (১) এই প্রথম একজন জার্মান রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাটরূপে অভিষিক্ত হলেন এবং পোপের দ্বারা এই অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হলো। (২) এই অভিষেকের ফলে একটি নতুন চিন্তা ও নতুন ধরনের সভ্যতার সূচনা হলো। (৩) এই ঘটনা একটি রাষ্ট্রীয় ধারণা এবং সরকার গঠনের ধারণাকেও রূপ দান করে; আবার এর দ্বারা শক্তি প্রয়োগের উপর লোকের বিশ্বাস জন্মে এবং মধ্যযুগীয় ইতিহাসের একটি ছকও তৈরি হয়ে যায়। এই সময় থেকেই এই পৃথিবী ঈশ্বরের নগরী, খৃষ্টধর্ম এবং রোমের সম্রাটের পদ স্বয়ং ঈশ্বরের সৃষ্টি—এই ধারণাও লোকের মনে বদ্ধমূল হতে থাকে। শার্লেমানের ধর্মীয় শাসন রোমান সভ্যতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি নতুন ধর্মীয় সাম্রাজ্যের জগৎ গড়ে তোলে। প্রকৃতপক্ষে শার্লেমানের অভিষেকের মধ্য দিয়ে দুটি ক্ষমতার তত্ত্ব গৃহীত হয়েছিল। এর ফলে পোপ এবং সম্রাট পৃথক পৃথক ক্ষেত্রে নিজেদের স্বাধীনতা ভোগ করতেন।

শার্লেমানের শিক্ষামূলক কার্যাবলী : সম্রাট হওয়ার পর শার্লেমান রোমের হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হলেন। জার্মানির **আকেন** শহরে তিনি নতুন রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। প্রথম জীবনে শার্লেমান নিজে নিরক্ষর ছিলেন কিন্তু বিদ্যাচর্চার দিকে তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল। নিজের চেষ্টায় তিনি গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষা লিখতে ও পড়তে শিখেছিলেন। নিজের দেশের জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে তিনি বহু দেশ থেকে জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের তাঁর রাজসভায় আনিয়েছিলেন। সেকালের ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষা **অ্যালকুইন** ছিলেন শার্লেমানের প্রধান পরামর্শদাতা ও সভাপণ্ডিত। রাজপরিবারের সন্তানদের শিক্ষার উদ্দেশ্যে শার্লেমান রাজপ্রসাদের মধ্যেই একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অ্যালকুইন ছিলেন তার অধ্যক্ষ। তা ছাড়া শিক্ষার মান যাতে উন্নত হয় সেদিকে শার্লেমানের সতর্ক দৃষ্টি ছিল। গির্জা ও মঠগুলিতে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষার প্রসারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। শার্লেমান যে যুগের সম্রাট ছিলেন ইউরোপে সে যুগ ছিল অন্ধকারময় যুগ। সেই

অন্ধকার যুগে শার্লেমান জ্ঞানের আলো জ্বালিয়েছিলেন। নতুন রোম সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ও মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ রাজা শার্লেমান ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

পোপের শাসন : পোপ-সম্রাট দ্বন্দ্ব : শার্লেমানের অভিষেক প্রসঙ্গে পোপের সঙ্গে সম্রাটের সম্পর্কের কথা আগেই বলা হয়েছে। শার্লেমানের সাহায্য ছাড়া পোপ লম্বার্ড শত্রুদের হাত থেকে রেহাই পেতেন না। শার্লেমান পোপের সঙ্গে মৌখিক সৌজন্য বজায় রেখে চলতেন। তবে নিজ রাজ্যে বিভিন্ন এলাকায় তিনি খুশীমতো বিশপ ও অন্যান্য ধর্মযাজকদের নিযুক্ত করতেন, পোপের দাবি মানতেন না। পবিত্র সাম্রাজ্যের গোড়ার দিকে সম্রাট ও পোপের মধ্যে প্রকাশ্যে কলহ শুরু হয়নি। বরং অনেক ক্ষেত্রে পরস্পর আপস ও সহযোগিতা চলছিল। কিন্তু একাদশ শতকের শেষদিকে উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব তীব্র আকার ধারণ করে। এই দ্বন্দ্বের মূল কারণগুলি হলো একদিকে সম্রাটের দাবি যে তিনি পোপের অধীনে নন বরং পোপই তাঁর বশ্য। যেহেতু সম্রাটই পোপকে তাঁর রাজ্যে অধিষ্ঠিত রেখেছেন, তাঁর শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রেখেছেন। আর পোপের দাবি যে সম্রাটই তাঁর বশ্য। যেহেতু সম্রাটকে তিনিই মুকুট দান করে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যে অধিষ্ঠিত করেছেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দু'পক্ষই অনেক সময়ে জেদ ও রেষারেষি করে বিবাদ ঘনিয়ে তুলেছিলেন। ফলে 'এম্পায়ার' বা সম্রাটের শাসনতন্ত্র, আর 'পেপ্যাসি' বা পোপতন্ত্র—এক কথায় সম্রাট ও পোপের পদাধিকার, ক্ষমতা, এক্তিয়ার প্রভৃতি প্রশ্ন নিয়ে পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক খারাপ হয়ে যায় এবং সেই সংঘর্ষ প্রায় দু'শ বছর চলেছিল।

রাষ্ট্র ও চার্চের মধ্যে সম্পর্ক : চার্চের প্রতি সম্রাটদের মনোভাব মধ্যযুগের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শার্লেমান চার্চের জন্য শুধুমাত্র যথেষ্ট সাহায্যই দেননি, তিনি চার্চের উপর নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ করার চেষ্টা করেন। খৃষ্টধর্মের 'দুই স্তম্ভ প্রথা' অর্থাৎ চার্চ ও রাজশক্তির পৃথকভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করার প্রথাটি তিনি রহিত করেন।

শার্লেমান ছিলেন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন শাসক। তিনি চার্চের গুরুত্ব উপলব্ধি

করতে পেরেছিলেন। তিনি স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিলেন মানুষের মন ধর্মবিশ্বাসে অটল, সেজন্য তিনি ধর্মীয় মনোভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শাসনবিধি প্রণয়ন করেছিলেন।

শার্লেমান চার্চের ব্যাপারে সহানুভূতিসম্পন্ন হলেও, অনেক সময় নিরপেক্ষ নীতি মেনে চলতেন। এটাই ছিল শার্লেমানের শাসননীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাঁর শাসননীতির অন্তরালে রাজকীয় স্বার্থ লুকানো ছিল। তিনি রাজকীয় ক্ষমতার বিন্দুমাত্র অপচয় না করে চার্চের কাছ থেকে যতদূর সম্ভব সুযোগ সুবিধা আদায়ের পক্ষপাতী ছিলেন।

শার্লেমান চার্চের প্রতি উদার মনোভাব দেখিয়ে নিজের ক্ষমতা বিস্তার করতে প্রয়াসী ছিলেন। তিনি নিজেকে পৃথিবীর ঈশ্বর এবং খৃষ্টানদের প্রভু, পিতা, রাজা, পুরোহিত, নেতা ও পথপ্রদর্শক বলে মনে করতেন। শার্লেমান পোপকে তাঁর পুরোহিত বলে মনে করতেন এবং স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, চার্চকে রক্ষা করা ও শাসন করা রাজারই কর্তব্য। পোপের কর্তব্য হচ্ছে সম্রাটের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা। তিনি মনে করতেন যাজকদের কার্যকলাপ ও আচরণ-বিধির জন্য আইন রচনা করা উচিত। এছাড়া ধর্মীয় রীতিনীতি এবং অনুষ্ঠানগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা তাঁরই কর্তব্য বলে মনে করতেন।

সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা: শার্লেমানের সাম্রাজ্যের মধ্যে ইউরোপীয় দেশগুলি পরস্পর যুক্ত হয়ে একটি সামগ্রিক ঐক্য গঠন করে। তাঁর রাজত্বকালেই তাই ইউরোপে নতুন সভ্যতার বিকাশ শুরু হয়। এই সময় জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প ও সাহিত্য চর্চারও প্রসার ঘটে। স্থানীয় রোমান ঐতিহ্যের সঙ্গে ক্যারোলিঞ্জীয় ঐতিহ্যের সমন্বয় সাধিত হয়ে এক নব-জাগরণের সূচনা দেখা দেয়। অষ্টম শতাব্দীর প্রথম দিকে ইউরোপীয় সংস্কৃতির অগ্রগতি একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায়। অ্যাংলো-স্যাক্সন মিশনারীদের প্রচেষ্টায় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আবার অগ্রগতি শুরু হয়। **কবি বনিফেস** ছিলেন এই সময়ের একজন প্রতিভাবান ব্যক্তি। তিনি নানা সংস্কারমূলক কাজের মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তারে প্রয়াসী হন। তিনি যাজকদের

মধ্যে শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন এবং ফুলডা নামক স্থানে একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। অল্পদিনের মধ্যে এই মঠ শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠে।

শার্লেমান রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে খ্যাতিমান পণ্ডিত ও ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিদের আহ্বান করে নিয়ে আসেন। এঁদের মধ্যে ইয়র্কের **অ্যালকুইন** ছিলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় আদর্শ শিক্ষক। তিনি বাইবেল ও অন্যান্য ধর্মপুস্তকের সংকলনের কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অ্যালকুইনের চেষ্টায় বর্ণমালা-সংস্কার হয়। তিনি এক নতুন ধরনের হাতের লেখা প্রচলন করেন। উন্নত মানের নির্ভুল পাঠ্যপুস্তক তৈরীর দিকেও শার্লেমানের লক্ষ্য ছিল।

শার্লেমানের জীবনী লেখক **এজিনহার্ড** সম্রাটের নিত্যসঙ্গী ছিলেন। শার্লেমান ইতালী থেকে **চার্লস পল দি ডেকন** নামক জনৈক লম্বার্ডকে এনেছিলেন। তাঁর রচিত **'লম্বার্ডদের ইতিহাস'** একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ। পিসার বৈয়াকরণিক **পিটার** এবং স্পেনের বিখ্যাত কবি **থিওডুল্ফ** শার্লেমানের রাজসভা অলংকৃত করেছিলেন। ফ্রাঙ্ক জাতির **এজিনহার্ড** প্রায় দু'হাজার পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেছিলেন।

শার্লেমান শিল্প ও স্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি খ্যাতিমান শিল্পী ও শ্রেষ্ঠ কারিগর আনিয়ে তাঁর রাজধানী **অ্যাকেন** শহরের গীর্জা নির্মাণ করিয়েছিলেন। **র‍্যাভেনা** থেকে মোজাইক আনিয়ে তিনি রাজপ্রাসাদ সুসজ্জিত করেছিলেন। মূর্তিনির্মাণ এবং অলংকরণ শিল্পেও এই যুগের শিল্পীরা খুবই উন্নত ছিল। এই সব কাজে তাঁর শিল্পরুচির প্রমাণ মেলে। এই সময়ের শিল্পরীতিতে বাইজান্টাইন ও মুসলিম শিল্পকলার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

অসাধারণ প্রতিভা, অদম্য জ্ঞানপিপাসা এবং নিরলস কর্মনিষ্ঠার জন্য শার্লেলান মধ্যযুগের জনগণের কাছে শ্রদ্ধার পাত্র বলে বিবেচিত হয়েছিলেন। কেবলমাত্র ইতিহাসেই নয়, সাহিত্যেও তাঁর কাহিনী অমর হয়ে আছে।

মধ্যযুগের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান মঠ: মধ্যযুগে রাজা ও সামন্তরা প্রধানত যুদ্ধবিগ্রহে ব্যস্ত থাকলেও সমাজে ধর্মের প্রভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ইউরোপের অধিকাংশ মানুষ খৃষ্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে। ধর্মযাজকদের কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নানাস্থানে মঠ গড়ে উঠে।

ক্যারোলিঞ্জীয় যুগে মঠগুলির প্রাধান্য খুবই বেড়ে যায় এবং এগুলি হয়ে উঠে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-কলা ও সাহিত্য চর্চার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র।

চার্চের গঠনতন্ত্র ঃ মধ্যযুগে নির্যাতিত খৃষ্টানরাই **ক্যাথলিক চার্চ** প্রতিষ্ঠা করেছিল। এই চার্চগুলিই ছিল খৃষ্টধর্মের ধারক ও বাহক। ধর্মের জন্য যাঁরা জীবন উৎসর্গ করতেন, তাঁরাই চার্চে সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসিনী হয়ে যোগদান করতেন। পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে রাষ্ট্রীয় অনুকরণে চার্চের গঠন-কাঠামো তৈরি হয়। এই ব্যবস্থায় খৃষ্টান জগতে সর্বপ্রধান ছিলেন রোমের **পোপ**। ধর্মীয় শাসন পরিচালনার জন্য সমগ্র খৃষ্টান জগতকে কয়েকটি প্রদেশে ভাগ করা হয়। প্রদেশিক যাজককে বলা হতো **আর্চ বিশপ**। প্রত্যেক প্রদেশকে কতকগুলি জেলায় ভাগ করা হয়। জেলার যাজককে বলা হতো **বিশপ**। বিশপের পরবত পদমর্যাদাসম্পন্ন খৃষ্টীয় যাজককে বলা হতো **প্রিস্ট**।



সন্ন্যাসী

চার্চের গঠনমূলক কাজ ঃ মধ্যযুগের বিশপদের মধ্যে প্রায় সকলেই ছিলেন দুর্নীতিপরায়ণ। যাজকরা ছিলেন সমাজের প্রকৃত বন্ধু। তাঁদের প্রত্যেককেই শিক্ষিত হতে হতো। দেশে বিদ্যালয় স্থাপন করা, শিক্ষা পরিচালনা করা, গরীব দুঃখীদের দেখাশোনা করা, অনাথ শিশুদের জন্য আশ্রম গড়ে তোলা, রোগীর চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল তৈরি করা প্রভৃতি নানা জন-হিতকর কাজের দায়িত্ব অর্পিত ছিল চার্চের যাজকদের উপর। তাঁদের পক্ষে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। ধর্ম ও সমাজকল্যাণমূলক কাজে তাঁরা সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করতেন।

যাজক শ্রেণীর আর এক অংশ সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করতেন। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ দুই-ই ছিল। মঠের নিয়ম অনুসারে সন্ন্যাসী এবং সন্ন্যাসিনীদের অবিবাহিত থাকতে হতো। প্রথম দিকে এরা খুবই কষ্টসাধ্য নিয়ম পালন করতেন এবং পবিত্র জীবন যাপনে অভিলাষী ছিলেন। কিন্তু পরবর্তিকালে তাঁদের মধ্যে নানা রকম দোষ-ত্রুটি দেখা দিতে

লাগল। মঠের সম্পদ বৃদ্ধির ফলে তাঁরা কষ্টসাধ্য নিয়ম পালন না করে বিলাসময় জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেন।

এই বিলাসময় জীবনযাত্রা এবং দুর্নীতিপূর্ণ আচরণ বন্ধ করার জন্য কয়েক জন সন্ন্যাসী অক্লান্তভাবে চেষ্টা করেছিলেন। এই সন্ন্যাসীদের মধ্যে ষষ্ঠ শতাব্দীতে **সেন্ট বেনেডিক্ট** যে সন্ন্যাসী সম্প্রদায় গড়ে তুলেছিলেন সেটিই ছিল সবচেয়ে প্রাচীন ও বিখ্যাত।

বেনেডিক্টের আদর্শ : বেনেডিক্ট নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, প্রত্যেক সন্ন্যাসী তাঁর মঠাধ্যক্ষের আদেশ পালন করবেন। পার্থিব সুখ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখবেন, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ত্যাগ করবেন এবং পরিশ্রম ও প্রার্থনায় কালাতিপাত করবেন। তাঁরা বিদেশে যেতে পারবেন ; কেউ কিছু খেতে দিলেও মঠের অধ্যক্ষের অনুমতি ছাড়া তা খেতে পারবেন না। বাড়ি থেকে লেখা কোন চিঠি তারা নেবেন না। খুব তাড়াতাড়ি শয্যা গ্রহণ করবেন। একবার কোন আদেশ দেওয়া হলে আর তা প্রত্যাহার করা হবে না। কেউ যদি আদেশ অমান্য করে, তা হলে, তাকে সতর্ক করে দেওয়া হবে অথবা মঠ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে ইত্যাদি।

বেনেডিক্টের মঠ ঃ বেনেডিক্ট ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান খৃষ্টভক্ত। তাঁর নিয়মাবলী প্রবর্তিত হওয়ায় মঠের জীবনযাত্রা পরিশুদ্ধ ও যুক্তি-নির্ভর হয়ে ওঠে। ইতালির মন্টিক্যাসিনোতে একটি মঠ তৈরি করে সেন্ট বেনেডিক্ট তাঁর শিষ্যদের জন্য আদর্শ নিয়ম তৈরি করেন। 'দেহকে অতিরিক্ত কষ্ট দিয়ে মুক্তিলাভ হয়'—একথা তিনি বিশ্বাস করতেন না। সরল জীবনযাপন, নিয়মানুবর্তিতা ও মঠাধ্যক্ষের প্রতি আনুগত্য বেনেডিক্ট বিধানের মূল কথা ছিল। এসব আচরণবিধি সাধারণ ভাবে বেনেডিক্টের শপথ বলা হয়।

ইউরোপে যখন দারুণ অশান্তি ও অরাজকতা চলছিল তখন মঠের শান্ত পরিবেশ ছিল পঠন পাঠনের খুবই উপযোগী। মঠের পরিচালনায় অনেক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়। ইউরোপে শিক্ষা প্রসারে মঠের পরিচালনাধীন

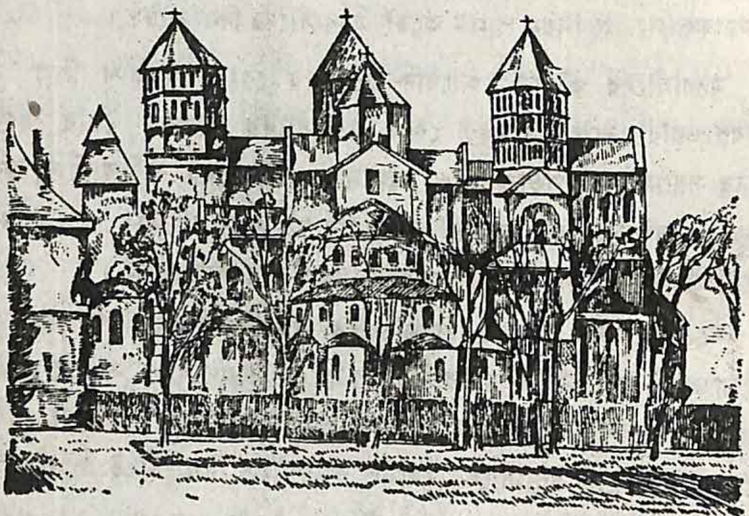
বিদ্যালয়গুলি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। প্রতিটি বিদ্যালয়ে স্বতন্ত্র পাঠাগার থাকত। বিদ্যাচর্চা করে, স্থানীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিয়ে, পাণ্ডুলিপি লিখে ও নকল করে, নিয়মিত প্রার্থনা ও অন্যান্য নানা ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ এবং নিয়ম পালন করেই মঠবাসীদের দিন কাটত।

মঠবাসীদের জীবনে আমোদ-প্রমোদের কোন অবকাশ ছিল না। আবহাওয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মঠবাসীদের পরিচ্ছদ তৈরি হতো। মঠের সন্ন্যাসীদের পড়াশুনা ও প্রার্থনায় বেশী সময় অতিবাহিত করতে হতো। লম্বার্ডরা দু'বার মন্টিক্যাসিনোর মঠ পুড়িয়ে দেয়। তখন মঠের বেনেডিক্ট শিষ্যরা কিছুকালের জন্য রোমে এসে বাস করেছিলেন।

মঠে জ্ঞানচর্চা : সেণ্ট বেনেডিক্টের পর **ক্যাসিওডোরাস** নামে এক বিদ্যোৎসাহী রাজকর্মচারী মঠের নিয়ম-কানুনের উল্লেখযোগ্য সংস্কার করেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি তাঁর পৈত্রিক বাস ভূমি **স্কুইলেসে** একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ মঠের সন্ন্যাসীদের দৈনিক কর্মসূচীতে বিদ্যাচর্চারই প্রাধান্য ছিল বেশী। ইতালি ও আফ্রিকা থেকে ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষায় লেখা বহু পুরানো পুঁথি সংগ্রহ করে সেগুলি নকল করার দায়িত্ব দেওয়া হয় মঠবাসীদের উপর। এই সংকলনের কাজে প্রচুর অধ্যবসায় এবং পড়াশুনার দরকার হতো। স্কুইলেস-মঠে এ কারণে এক বিশাল গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল। ক্যাসিওডোরাস ও তাঁর অনুগামীদের এই প্রচেষ্টার ফলে প্রাচীনকালের বহু অমূল্য গ্রন্থ যথাযথ যত্ন ও চর্চার অভাবে বিনষ্ট হতে পারেনি। মঠের তত্ত্বাবধানে বিদ্যালয় স্থাপন করে সাধারণ মানুষকে তাঁরা শিক্ষিত করে তুলতে চেয়েছিলেন। দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপে জ্ঞানচর্চার ধারাকে অব্যাহত রেখেছিলেন স্কুইলেস ও অন্যান্য মঠের সন্ন্যাসীরা।

ক্লুনির সংস্কার আন্দোলন : নবম শতাব্দীতে ইউরোপে সামন্তপ্রথার উদ্ভব ঘটে। সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থনীতির উপর ঐ প্রথা যে প্রভাব বিস্তার লাভ করেছিল, তাতে মঠগুলির আদর্শ ও জীবনযাপন পদ্ধতির অনেক পরিবর্তন ঘটে। মঠগুলিতে সামন্তশ্রেণীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সামন্ত সর্দারগণ

তাঁদের ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি নিয়ে মঠগুলি পরিচালনা করতে থাকেন। এতে উন্নত জীবনাদর্শ ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়। আবার অনেক সময় মঠের সঙ্গে সম্পর্কহীন গৃহী মানুষদের উপরও মঠ পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হতো।



ক্লুনির মঠ

তাঁরা ধর্মীয় কার্যকলাপের চেয়ে ব্যবসায়ভিত্তিক লাভ-লোকসানের কথা বেশী ভাবতেন। পশ্চিম ইউরোপের সর্বত্র এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য সংস্কার-পন্থীরা সক্রিয় হয়ে উঠেন এবং মঠের এইরূপ অধঃপতনের জন্য প্রকাশ্যে নিন্দা করতে থাকেন। বেনেডিক্ট পন্থী ক্লুনি মঠেই সর্বপ্রথম সংস্কার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। পরে ইউরোপের অন্যান্য দেশের মঠগুলিতে ক্লুনির কর্মসূচী প্রবর্তন করা হয়।

অ্যাকুইটেনের ডিউক উইলিয়াম ৯১০ খৃষ্টাব্দে পূর্ব ফ্রান্সের বার্গাণ্ডির ক্লুনিতে একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। এই মঠ প্রতিষ্ঠার সনদে বলা হয় যে, এই মঠ রাষ্ট্রীয় সকল প্রকার নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত থাকবে এবং মঠের ভূসম্পত্তির জন্য রাষ্ট্রের প্রতি মঠের কোন আনুগত্য থাকবে না। মঠের এই সনদ বহু ধনী লোককে এই মঠের জন্য মুক্তহস্তে দান করতে অনুপ্রাণিত

করে। ফলে ক্লুনি মঠের বহু শাখা ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থাপিত হয়। একমাত্র পোপ ভিন্ন এই মঠের উপর আর কারো নিয়ন্ত্রণ অধিকার ছিল না। ক্লুনির শাখা মঠগুলিতে কোন অধ্যক্ষ নিয়োগ করা হতো না। ক্লুনির নির্দেশে সেগুলি পরিচালিত হতো। ক্লুনির প্রতিনিধিরা নিয়মিত সব মঠের কাজকর্ম পরিদর্শন করতেন। এইভাবে মঠ চালনায় একটি সুসংহত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে ক্লুনির অধীনে তিনশ' মঠ ছিল।

ক্লুনির আন্দোলন কেবল মঠ সংস্কারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ক্লুনির সন্ন্যাসীরা ছিলেন সকলের শ্রদ্ধাভাজন। তাই চার্চ তাদের মধ্য থেকে বিভিন্ন জায়গায় বিশপ নিয়োগ করার ব্যবস্থা করেন। লোরেনে সর্বপ্রথম এই নীতি গৃহীত হয়। ক্লুনির সন্ন্যাসীদের প্রভাবেই চার্চের পুরোহিত বা যাজকদের ব্রহ্মচর্যপালন অবশ্য কর্তব্য হয়ে উঠে এবং বিভিন্ন পদে কেবলমাত্র নির্বাচিত যাজকদের নিয়োগ করা হতে থাকে। এর ফলে চার্চের উপর রাজা ও সামন্ত সর্দারদের যে কর্তৃত্ব ছিল তা ক্ষুণ্ণ হওয়ার উপক্রম হলো। একাদশ শতাব্দীতে পোপ ক্লুনির আদর্শ মেনে নেওয়ায় রাজশক্তি ও চার্চের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী বিরোধের সূত্রপাত হয়।

এই নতুন সংস্কার প্রবর্তনের ফলে চার্চের দুর্নীতি দূর হয় এবং চার্চ আরও বেশী শক্তিশালী হয়ে উঠে। চার্চ এর পর থেকে শুধু ধর্মের ব্যাপারে কর্তৃত্ব করেই নিশ্চুপ রইলো না, রাজনীতি ইত্যাদি ধর্মের বাইরের ব্যাপারেও নেতৃত্ব দিতে চাইল। রাজা ও সামন্তগণ তাতে বাধা দিয়েছিলেন। বিশপদের নিয়োগের সময় রাজা বা তাঁর অধীনস্থ কোন সামন্ত আনুষ্ঠানিক ভাবে তাদের হাতে একটি আংটি বা ছোট ছড়ি তুলে দিয়ে দায়িত্ব ন্যস্ত করতেন। এ ব্যবস্থাকে তাঁরা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষ অধিকারের প্রতীক বলে মনে করতেন। চার্চ ঐ রীতি তুলে দিতে চাওয়ায় যে বিবাদের সৃষ্টি হয় তাকে **ধর্মীয় দায়িত্ব অর্পণের যুদ্ধ** বলে অভিহিত করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, শিক্ষার প্রসার : মধ্যযুগের শুরুতে ইউরোপে বিদ্যাচর্চার সুযোগ খুব কম ছিল। বিদ্যাচর্চায় সাধারণ মানুষের আগ্রহও তেমন বিশেষ ছিল না। লেখাপড়া শেখায় যাদের আগ্রহ ছিল তারা চার্চ

অথবা মঠে যোগ দিত। চার্চ ও মঠই ছিল সে যুগের বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র। একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে মঠ ও চার্চের উদ্যোগে বহু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয় ছিল উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্র। মঠগুলির সঙ্গে যুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে খ্যাতনামা শিক্ষক থাকলে দূর দূরান্ত থেকে ছাত্র আসত তাঁর কাছে পাঠ নিতে। অপরপক্ষে খ্যাতনামা শিক্ষকরাও এক বিদ্যালয় থেকে অন্য বিদ্যালয় গিয়ে শিক্ষাদান করতে থাকেন। ভ্রাম্যমাণ অধ্যাপক ও ভ্রাম্যমাণ ছাত্রগণ—এই ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম অবস্থা। পরবর্তিকালে মধ্যযুগে ধর্মশাস্ত্রের প্রধান কেন্দ্ররূপে ফ্রান্সের **প্যারিস**, চিকিৎসা বিদ্যার কেন্দ্ররূপে দক্ষিণ ইতালির **স্যালার্নোর**, আইন চর্চার কেন্দ্ররূপে উত্তর ইতালির **বলোনা** বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। মধ্যযুগে ইংলণ্ডে প্রথম **অক্সফোর্ড** ও কিছুকাল পরে **কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়** স্থাপিত হয়।

মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকতা করে যে সব মনীষী বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিলেন, জার্মান দার্শনিক **অ্যালবার্ট ম্যাগনাস**-এর নাম তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ইনি ছিলেন ত্রয়োদশ শতাব্দীতে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক। যে যুগের রীতি অনুযায়ী অ্যালবার্ট কেবল একটি বিষয়ে চর্চা না করে, বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করেন। যুক্তি ও বাস্তব অভিজ্ঞতার দ্বারা সবকিছু বিচার করাই ছিল তাঁর স্বভাব। অ্যারিস্টটলের দর্শন, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূ-তত্ত্ব, প্রাণিবিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যা সম্পর্কে তিনি মোট একুশখানা গ্রন্থ রচনা করেন। মহাজ্ঞানী **টমাস একুইনাস** ছিলেন অ্যালবার্ট ম্যাগনাসের ছাত্র। ইতালির এক অভিজাত পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। দর্শন ও ধর্মতত্ত্বে তিনি অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দেন। পাণ্ডিত্যের জন্য স্বয়ং পোপ তাঁকে পরামর্শদাতা নিযুক্ত করেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রবার্ট **গ্রোসেটিস্ট** দর্শনশাস্ত্র, গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও পদার্থবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। **রোজার বেকনও** ছিলেন অক্সফোর্ডের অধ্যাপক। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ প্রকৃতিকে কাজে লাগাতে পারে। দৃষ্টিবিজ্ঞানের উপর তাঁর গবেষণা থেকেই পরবর্তী কালে চশমা, অনুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের

আবিষ্কার হয়েছিল। ভূ-বিদ্যা ও যন্ত্রবিদ্যায়ও রোজার বেকনের অবদান ছিল। ফরাসী পণ্ডিত **অ্যাবেলার্ড** ছিলেন প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিখ্যাত অধ্যাপক। দর্শন ও তর্কবিদ্যায় পারদর্শিতার জন্য ছাত্রদের কাছে তিনি খুব প্রিয় ছিলেন। মধ্যযুগে শিক্ষা দীক্ষা ল্যাটিন ভাষায় চলত। ইতালির কবি দান্তে এই ভাষায় তাঁর অমর কাব্য ডিভাইন কমেডি রচনা করেন। ফরাসী দেশের দক্ষিণে ক্রবেদর নাইটরা তাঁদের বীর গাথাগুলি কথ্য ভাষায় রচনা করেন। রাজা আর্থার ও তাঁর সহচর রোল্যাণ্ড এবং শার্লেমান সম্পর্কে এই সব বীর গাথা রচিত হয়। ইংরাজ লেখক চসার ক্যাণ্টারবেরীর গল্প নামে বিখ্যাত উপন্যাস এই যুগে রচনা করেন।

মধ্যযুগে শিক্ষা-পরিচালনা পদ্ধতি ঃ মধ্যযুগে কয়েকটি মনাস্টারী বা মঠ বিদ্যাচর্চার জন্য বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল। দেশবিদেশের বহু ছাত্র এসব স্থানে শিক্ষালাভ করতে আসত। এছাড়া শিক্ষক ও ছাত্রেরা একত্রিত হয়েও বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের মত অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। খ্যাতনামা পণ্ডিতদের কাছ থেকে সাহিত্য, কলা, আইন, চিকিৎসা ও ধর্মশাস্ত্র পঠন-পাঠনের জন্য শিক্ষার্থীরা দূর-দূরান্তর থেকে পায়ে হেঁটে, বহু কষ্ট সহ্য করে এসব শিক্ষাকেন্দ্রে উপস্থিত হতেন। পাঁচ বছরের শিক্ষা শেষে ছাত্ররা ডিগ্রী পেতেন। যে-সব ছাত্র আরও তিন বছর পড়াশুনা করতেন, তাঁরা মাস্টার অব আর্টস্ উপাধি পেতেন।

মুদ্রাযন্ত্রের তখনও আবিষ্কার হয় নি। তাই ছাপা বইপত্রের অভাবে শিক্ষাগ্রহণ করা বড়ই কষ্টসাধ্য ছিল। ছাত্রেরা ভোর ছটা থেকে দশটা পর্যন্ত অধ্যাপকের বক্তৃতা শুনত; তারপর বিষয় সম্বন্ধে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করত। চামড়ার উপর লেখা কিছু কিছু পুঁথি বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত হলেও, খুব কম ছাত্রই সেগুলি পড়বার সুযোগ পেত। অধ্যাপকের বক্তৃতার উপরেই ছাত্রদের সর্বতোভাবে নির্ভর করতে হতো। অবশ্য এতে ছাত্রদের স্মৃতিশক্তির চর্চা ও চিন্তা করার অভ্যাস হতো।

তখনকার শহরগুলিতে বিদেশীদের কোন রকম অধিকার দেওয়া হতো না। তাই ভিন্ন ভিন্ন দেশের শিক্ষক ও ছাত্ররা পরস্পরকে সাহায্য করবার

জন্য এক একটি সঙ্ঘ বা সমিতি গড়ে তুলতেন। ছাত্ররা একই রকম পোশাক পরত এবং নিজেকে বিশেষ বিদ্যালয়ের ছাত্র বলে গৌরব বোধ করত। এর ফলে তাঁদের মধ্যে একত্ববোধ এসেছিল। সাধারণতঃ ছাত্রদের সঙ্গে অধ্যাপকদের সম্পর্ক খুবই মধুর ছিল। কিন্তু শহরের লোকদের সঙ্গে ছাত্রদের বিবাদ-বিসম্বাদ লেগেই থাকত। শৃঙ্খলা ও সামাজিক দায়িত্বের অভাবেই এগুলি ঘটত বলে মনে হয়।

কালপঞ্জী

১. শার্লেমানের ক্ষমতায় অধিষ্ঠান—৭৭১ খৃষ্টাব্দ।
২. শার্লেমান কর্তৃক পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের পুনরুদ্ধার—৮০০ খৃষ্টাব্দ।
৩. শার্লেমানের অভিষেক উৎসব - ৮০০ খৃষ্টাব্দ।

অনুশীলনী

মৌখিক প্রশ্ন * * * **এক নম্বর**

১. শার্লেমান কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করেন?
২. পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য কে পুনরুদ্ধার করেন?
৩. খৃষ্টানদের প্রধান ধর্মগুরুকে কি বলে?
৪. কত খৃষ্টাব্দে শার্লেমান এর অভিষেক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়?
৫. শার্লেমান কোথায় রাজধানী স্থাপন করেছিলেন?
৬. অ্যালকুইন কে ছিলেন?
৭. কীব বানিফেস কেন্ মঠে বাস করতেন?
৮. বেনেডিক্ট কে ছিলেন?
৯. স্কুইলেস মঠ কে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন?
১০. ক্লুনির মঠ কে কত খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন?

সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন * * * * * * * **৩ নম্বর**

১. শার্লেমান কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করেন? কত খৃষ্টাব্দে তিনি ফ্রাঙ্কদের রাজা হন? [১+২]
২. শার্লেমানের দৈহিক গঠন কেমন ছিল? [৩]
৩. শার্লেমান কি ভাবে লম্বার্ড রাজ্য অধিকার করেছিলেন? [৩]

৪. রোল্যান্ড কে ছিলেন ? তাঁর বীরত্ব কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা কর। [১+২]
৫. শার্লেমানের অভিষেক কাহিনী সংক্ষেপে আলোচনা কর। [৩]
৬. শার্লেমানের বিদ্যাচর্চা সংক্ষেপে আলোচনা কর।
৭. শার্লেমানের সঙ্গে পোপের সম্পর্ক কেমন ছিল ?
৮. ধর্মীয় শাসন পরিচালনার জন্য খৃষ্টান জগতকে কিভাবে ভাগ করা হয়েছিল। [৩]
৯. সন্ন্যাসীদের প্রতি বেনেডিক্টের নির্দেশ কি ছিল ? [৩]

রচনাত্মক প্রশ্ন ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ **৯নম্বর**

১. পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য বলতে কি বুঝায় ? কি ভাবে এবং কেন এই সাম্রাজ্য স্থাপন করা হয়েছিল ? [৪+৫]
২. পোপের সঙ্গে শার্লেমানের সম্পর্ক কেমন ছিল ? [৯]
৩. শিল্পে ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে সম্রাট শার্লেমান কি ভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন ? [৯]
৪. খৃষ্টীয় মঠে সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীরা কি ভাবে জীবনযাপন করতেন, তার বর্ণনা দাও। [৯]
৫. সেণ্ট বেনেডিক্টের নিয়মাবলী মঠের জীবনযাত্রায় কি পরিবর্তন এনেছিল ? [৯]
৬. ইউরোপীয় মঠগুলির সংস্কারের প্রয়োজন হয়েছিল কেন ? ক্লুনি মঠের সংস্কার পরিকল্পনা বর্ণনা কর। [৪+৫]
৭. জ্ঞানচর্চায় মঠের ভূমিকা কি ছিল ? চার্চের উপর ক্লুনির সংস্কার আন্দোলনের প্রভাব বর্ণনা কর। [৪+৫]
৮. দ্বাদশ শতাব্দীতে কি ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হয় ? এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের জীবনধারা বর্ণনা কর। [৪+৫]

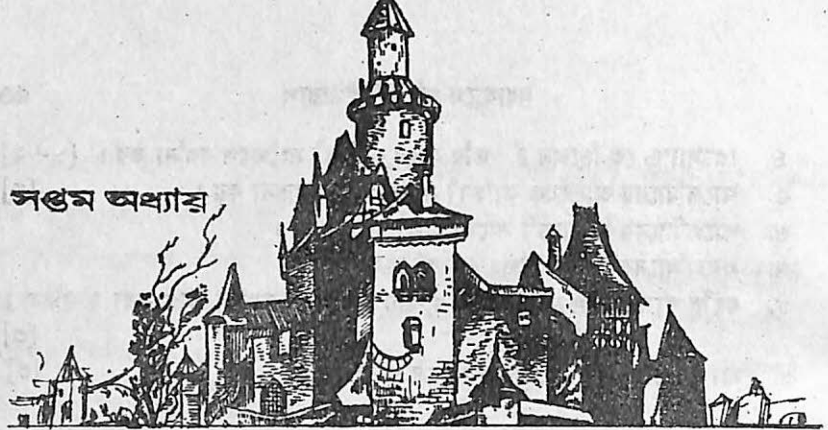
বিষয়মুখী প্রশ্ন - - - - - - - - - - - - - - **এক নম্বর**

শূন্যস্থান পূর্ণ কর :

ক. —— খৃষ্টাব্দে মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে ফ্রাংকদের রাজা হলেন শার্লেমান। খ জার্মানির —— শহরে শার্লেমান নতুন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। গ. ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ পন্ডিত —— ছিলেন শার্লেমানের প্রধান পরামর্শদাতা ও সভাপন্ডিত। ঘ. খৃষ্টান জগতের প্রধান ছিলেন ——। ঙ. —— প্রতিষ্ঠিত ক্লুনি মঠের উপর —— ছাড়া আর কারও নিয়ন্ত্রণ ছিল না।

———

সপ্তম অধ্যায়



মধ্যযুগে ইউরোপে সামন্ততন্ত্র

রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর ইউরোপের সর্বত্র এক অরাজকতার যুগ নেমে আসে। বেশ কয়েক-শ' বছর ধরে এই অবস্থা চলতে থাকে। এই সময় জনগণের মধ্যে শিক্ষা ও সভ্যতা বলতে কিছুই ছিল না। শার্লেমান পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য স্থাপন করে ইউরোপে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার যে চেষ্টা করেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বিফল হওয়ার উপক্রম হয়। শার্লেমানের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে কেউ তেমন যোগ্যতার পরিচয় দিতে না পারায় নবম শতাব্দীর মধ্য ভাগ থেকে আবার গোলযোগ শুরু হয়ে যায়। নর্স, ম্যাগিয়ার, শ্লাভ প্রভৃতি জাতির আক্রমণে ইউরোপে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। দেশের সর্বত্র অরাজকতা দেখা দেয় অত্যাচার ও উৎপীড়নে সাধারণ লোকের দুঃখকষ্টের সীমা থাকে না। এই অসহনীয় অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় সাধারণ লোক ক্ষমতাবান লোকের আশ্রয় খুঁজতে থাকে। এই ক্ষমতাবান লোকেরাই ছিলেন দেশের জমিদার শ্রেণী। এঁরাই একদা রাজকীয় কর্মচারীদের সহায়তায় কেন্দ্রীয় সরকারকে দুর্বল করেছিলেন, আবার এঁরাই বর্বর জাতিসমূহের আক্রমণ থেকে ইউরোপকে রক্ষায় প্রয়াসী হয়েছিলেন। গৌরবহীন দুর্বল রাজাদের পরিবর্তে এই জমিদারগণের নেতৃত্বে ইউরোপে জনগণের মধ্যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এই নতুন ব্যবস্থাই হলো **সামন্ত প্রথা**। এই প্রথা ৮০০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৩০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বিকাশলাভ করেছিল। পঞ্চদশ শতকে জাতীয় রাষ্ট্রসমূহের উৎপত্তি হওয়ায় সামন্ত-প্রথা ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যায়।

সামন্ত-প্রথার বৈশিষ্ট্য ঃ নবম, দশম ও একাদশ শতাব্দীতে ইউরোপের

অধিকাংশ দেশে সামন্তপ্রথার সাধারণ লক্ষণগুলি বিদ্যমান থাকলেও প্রত্যেক দেশে এর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল। ফরাসী দেশে এই প্রথার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ঘটে এবং সেখান থেকে ইতালি ও জার্মানিতে তা ছড়িয়ে পড়ে। তবুও ফ্রান্সের সামন্তপ্রথার সঙ্গে সঙ্গে ইতালি কিংবা জার্মানিতে এই প্রথার বিশেষ পার্থক্য চোখে পড়ে। কোন দেশে সামান্তপ্রথা প্রচলিত থাকলেও সেখানকার সব জমি বা প্রত্যেকটি অধিবাসী যে এই প্রথার অধীন ছিল তা সঠিকভাবে বলা যায় না। ফ্রান্স ও জার্মানির কোন কোন জমির মালিকরা সামন্ত বিশেষের প্রজা ছিলেন না। তা ছাড়া ইংলণ্ড, সিসিলি প্রভৃতি দেশে অন্য দেশের অনুকরণে যে সামন্ত প্রথার উদ্ভব হয়েছিল তারও নিজস্ব রূপ ছিল।

সামন্ত-প্রথার রাজনৈতিক লক্ষণ : রাজনৈতিক দিক দিয়ে বিচার করলে সামন্ত প্রথাকে বলতে হয় মধ্যযুগের স্বাভাবিক শাসনপদ্ধতি। জমির মালিকানার সঙ্গে শাসন ক্ষমতার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কই এর বিশেষত্ব। রাজা পূর্বে যে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, সামন্ত প্রথা প্রবর্তনের পর সামন্ত অর্থাৎ বড় বড় জমিদারগণ তার অধিকারী হন। কোন কোন সময়ে রাজকর্মচারী জোর করে শাসনক্ষমতা দখল করতেন এবং অসহায় রাজা তা স্বীকার করে নিতেন। আবার অনেক সময় রাজা নিজের অক্ষমতা বুঝে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ক্ষমতা হস্তান্তর করতেন। এই ক্ষমতা হস্তান্তরের আরও একটি কারণ ছিল বহিঃশত্রুর আক্রমণ। এই আক্রমণে দিশেহারা প্রজাগণ রাজশক্তির সাহায্য না পেয়ে নিজেদের পছন্দমত নেতা নির্বাচন করত এবং তাঁরই পরামর্শ মত আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করত। এই নেতাই রাজার স্বীকৃতি পেয়ে সামন্তরূপে গণ্য হতেন। এইভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের ফলে সারাদেশে ছোট ছোট অসংখ্য ব্যক্তিকেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠে। সামন্তদের হাতে রাজনৈতিক দায়িত্ব তুলে দেবার পর রাজা তাঁর স্থায়ী সৈন্যদল ভেঙ্গে দিতেন। দেশরক্ষা বা অন্য প্রয়োজনে তিনি সামন্তদের আদেশ করা মাত্র তাঁরা সৈন্যসহ উপস্থিত হতে বাধ্য ছিলেন। সামন্তরা আবার তাঁদের অধীন প্রজাদের মারফত সৈন্যসংগ্রহ করতেন। পরবর্তিকালে

সামরিক দায়িত্বপালনের পরিবর্তে অর্থদান রীতি প্রচলিত হয়েছিল। ইংলণ্ডে একে বলা হতো **স্কুটেজ**।

রাজা তাঁর রাজনৈতিক ক্ষমতা সামন্ত বা জমিদারদের হাতে সমর্পণ করলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন আইন ও বিচার ব্যবস্থার চূড়ান্ত নিয়ামক। সামন্তদের চেয়ে অনেক কম জমির মালিক হয়েও তিনি ছিলেন তাঁদের প্রভু।

সামন্ত-প্রথার সামাজিক লক্ষণ ঃ সামন্ততান্ত্রিক ব্যক্তিসম্পর্কই ছিল সামন্ত প্রথার মূল কথা। জমির মালিকানা নিয়ে মানুষের সঙ্গে মানুষের এই সম্পর্ক গড়ে উঠতো। জমি হস্তান্তর উপলক্ষ্যে দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে এক ধরনের চুক্তি হতো। এই চুক্তি অনুযায়ী দাতা হতেন প্রভু এবং যিনি জমি পেতেন তিনি হতেন প্রজা। মধ্যযুগে দেশের সমস্ত জমির মালিক ছিলেন রাজা। তিনি তাঁর বিশ্বাসী লোকজনদের মধ্যে ঐ জমি বিলি করতেন এবং প্রয়োজনের সময় তাঁদের কাছ থেকে সাহায্য পেতেন। এদের বলা হত **মুখ্য প্রজা**। ডিউক, কাউন্ট প্রভৃতি ছিল মুখ্য প্রজাদের উপাধি। রাজার দেওয়া জমি মুখ্য প্রজারা আবার তাদের মনোমত লোকের মধ্যে বিলি করে দিতেন। এরা **মধ্য প্রজা** বলে অভিহিত হতেন।

এইভাবে ধাপে ধাপে জমির মালিকানা ও ভোগ দখলের বিষয়টি রাজার স্তর থেকে শুরু করে ক্রমেই নিচের স্তর পর্যন্ত সম্প্রসারিত হতো। প্রতিটি স্তরের মালিক ও ভোগ দখলকারীর মধ্যে পর্যায়ক্রমে যে বোঝাপড়া ও চুক্তি হতো সেটাই ধাপে ধাপে বিন্যস্ত হয়ে এক জটিল ও পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তোলে।

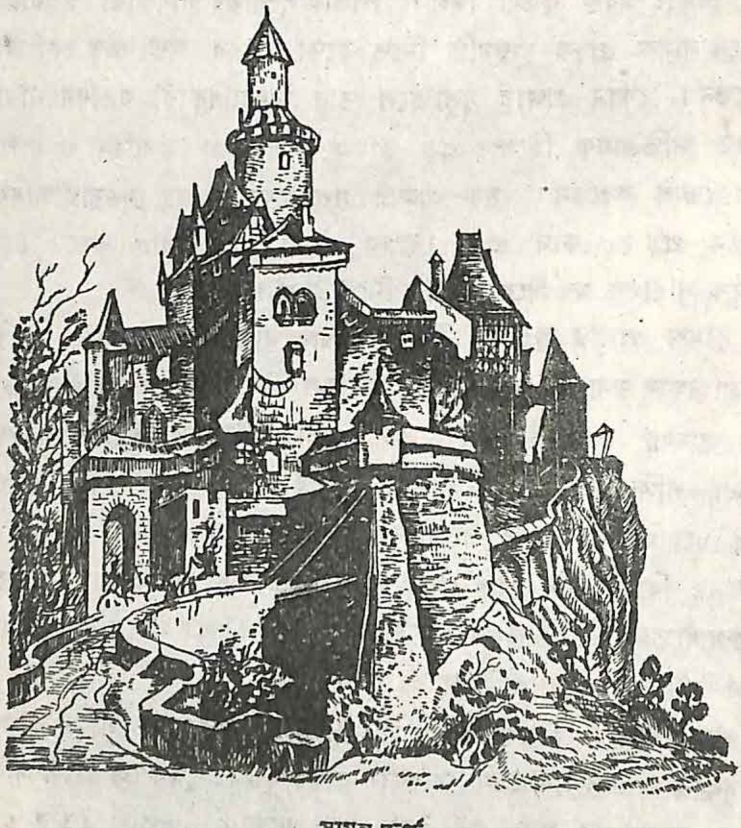
সামন্ততন্ত্রের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল প্রভু ও প্রজার পারস্পরিক নির্ভরতা। জমি লাভের সময় প্রজা তার প্রভুর প্রতি অনুগত থাকার শপথ নিত এবং নিজের সমস্ত শক্তি প্রভুর সেবায় নিয়োজিত করত। অপরপক্ষে প্রভুও বিপদে আপদে প্রজাকে রক্ষা করবার প্রতিশ্রুতি দিতেন। চুক্তিরক্ষার দায়িত্ব ছিল প্রভু ও প্রজা উভয়ের। একপক্ষ চুক্তি অমান্য করলে অপরপক্ষ তার দায় থেকে মুক্তি পেতেন। সামন্ত প্রজার প্রভুর প্রতি

নানারকম দায়িত্ব ছিল। তাকে সামন্ত প্রভুর পক্ষ অবলম্বন করে যুদ্ধ করতে হতো। অপরাধীর বিচারকালে প্রভুর নির্দেশ মত উপস্থিত থেকে তাকে পরামর্শ দিতে হতো। যে কোন ব্যয়বহুল কাজে প্রভুকে অর্থ সাহায্য করা প্রজার অবশ্য কর্তব্য ছিল। পিতার সম্পত্তির অধিকারী হওয়ার জন্য পুত্রকে সামন্ত প্রভুর অনুমতি নিতে হতো। এর জন্য প্রভু অর্থ আদায় করতেন। কোন প্রজার মৃত্যু হলে তার উত্তরাধিকারী যতদিন নাবালক থাকত অভিভাবক হিসেবে প্রভু তার সম্পত্তি রক্ষা করতেন ও সম্পত্তির আয় ভোগ করতেন। মৃত প্রজার সন্তানদের বিবাহ দেওয়ার অধিকারী ছিলেন প্রভু। কোন প্রজা নিজের ইচ্ছা মত বিবাহ করতে চাইলে প্রভুকে পরিমিত অর্থ দিয়ে অনুমতি নিতে হতো।

সামন্ত প্রথার গুরুত্ব ঃ ইউরোপে রাজনৈতিক সংকটের দিনে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এই প্রথার উদ্ভব হয়েছিল এবং অশান্ত যুগকে শান্ত করতে এর সাফল্য সর্বজনস্বীকৃত। এই প্রথার প্রভাবে অরাজকতা থেকে শৃঙ্খলা, শক্তি উন্মাদনা থেকে ন্যায় বিচার এবং আনুগত্য থেকে সম্মানের উদ্ভব হয়েছিল। রাজার সামন্তদের দরবারে জুরীর মাধ্যমে বিচার এবং আইনের বিচারে ধন প্রাণ রক্ষার রীতি প্রচলিত হয়েছিল। মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গঠনমূলক প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করে সামন্তপ্রথা পরবর্তি-কালে ব্যক্তিত্বের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়েছিল।

সামন্ত দুর্গ ঃ সামন্ত প্রথার যুগে ইউরোপে যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকত। এই যুদ্ধকে সামন্তগণ বলতেন 'অধিকার রক্ষার যুদ্ধ।' যুদ্ধকালে প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য দুর্গ তৈরি করা হতো। এগুলি তৈরি হতো ভূমিদাসদের গ্রাম থেকে কিছুটা দূরে কোন পাহাড়ের উপরে কিংবা বেশ উঁচু জায়গায়। সামন্তরা তাদের সৈন্য-সামন্ত নিয়ে ঐ দুর্গে বাস করতেন। গোড়ার দিকে দুর্গ তৈরি করা হতো গাছের বড় বড় গুঁড়ি দিয়ে। পরে পাথরের দুর্গ তৈরি আরম্ভ হয়। দুর্গগুলি খুবই সুরক্ষিত থাকত। এর ভিতরে সহজে প্রবেশ কিংবা আক্রমণ করা সহজসাধ্য ছিল না। দুর্গের চারিদিকে খনন করা হতো গভীর পরিখা বা খাল। ঝুলন্ত একটি সেতুর সাহায্যে দুর্গ থেকে

বাইরে যাতায়াতের ব্যবস্থা ছিল। প্রয়োজন মত সেতুটি তুলে নেওয়া যেত। দুর্গ ঘিরে থাকত আট থেকে পঁচিশ ফুট চওড়া পাঁচিল। পরিখা ও পাঁচিল অতিক্রম করে দুর্গে প্রবেশ করা এক কথায় অসম্ভব ছিল। দুর্গের ভিতরে সৈন্যরা শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করতো। দুর্গ ছিল সামন্তদের কর্মকেন্দ্র।



সামন্ত দুর্গ

এখানে ছিল তদের বিচারালয় এবং আয়ব্যয়ের হিসাব ও যাবতীয় তথ্য সংস্করণের ব্যবস্থা।

বর্মাচ্ছাদিত অশ্বারোহীর ভূমিকা : মধ্যযুগের যুদ্ধে অশ্বারোহী সৈনিকের বিশেষ ভূমিকা ছিল। সামন্ত প্রভু ও যোদ্ধারা সাধারণত ছিলেন অশ্বারোহী। অস্ত্র হিসেবে তারা ব্যবহার করত তরবারি ও লম্বা ধরনের বর্শা। শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য সে যুগে অশ্বারোহী এবং

অশ্বের প্রধান প্রধান অঙ্গ বর্ম দিয়ে ঢেকে দেওয়া হতো। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে সর্বাঙ্গ ঢাকা লোহার বর্ম পরার রীতি প্রচলিত হয়। বন্দুক ও বিস্ফোরক আবিষ্কৃত হওয়ার আগে বর্মপরা অশ্বারোহী যোদ্ধাদের কৃতিত্বেই যুদ্ধের ফলাফল নির্ভর করত। তুর্কীদের হাত থেকে কনস্টান্টিনোপল রক্ষায় এবং ধর্মযুদ্ধে ইউরোপীয় অশ্বারোহী যোদ্ধাদের উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল।

সামন্ততান্ত্রিক যুগে জীবনযাত্রা : সামন্ততান্ত্রিক যুগে জীবনযাত্রা খুবই অনাড়ম্বর ছিল। পূর্বের উৎপাদন ব্যবস্থা ধ্বংস হয়েছিল। পথঘাট হয়েছিল বিপদসংকুল, ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য বিশেষ প্রসারলাভ করতে পারেনি। তাই সামন্ততান্ত্রিক যুগে জীবনযাত্রা এক একটি গ্রামীণ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। গ্রামগুলি ছিল কৃষিপ্রধান। এখানে পশুপালনের অসুবিধা ছিল না। আপেল, নাসপাতি, চেরী ইত্যাদি ফলের চাষ হতো।

সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা আদৌ সচ্ছল ছিল না। সামন্ত প্রভুদের জীবনযাত্রাও ছিল অনাড়ম্বর। এঁরা পশমের মোটা পোশাক পরতেন।

সামন্ত প্রভুরা ঘরে আসবাব-পত্র রাখা পছন্দ করত না। শোয়ার জন্য কাঠের তৈরি উঁচু একখানা খাট, কয়েকখানা সাধারণ চেয়ার ও সিন্দুক ছিল প্রধান আসবাব-পত্র।

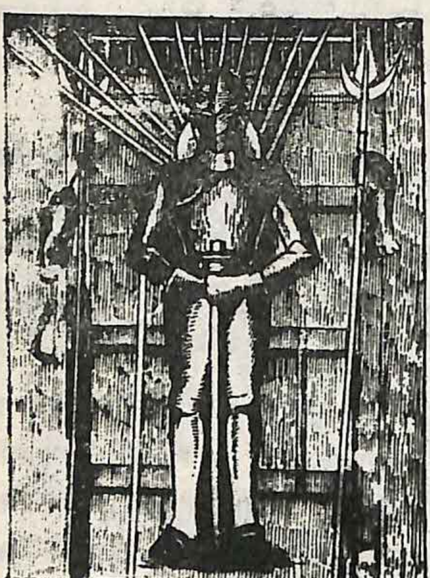
বিভিন্ন প্রকার খাদ্য পাওয়া না গেলেও অপর্যাপ্ত খাদ্য মধ্যযুগে পাওয়া যেত। খাদ্যসামগ্রী সাধারণ ভাবে রন্ধন করা হতো। ধর্মযুদ্ধের পর মশলা যোগে খাদ্যসামগ্রী সুস্বাদু করার ব্যবস্থা হয়। সাধারণতঃ যে সব সবজি ব্যবহার করা হতো তাদের মধ্যে বাঁধাকপি, গাজর, পেঁয়াজ, মটরশুঁটি ও ওলকপি ছিল উল্লেখযোগ্য। ফলের মধ্যে আপেল, নাসপাতি ও চেরী ফলের প্রচলন ছিল। খাদ্যের প্রধান উপাদান ছিল মাংস ও মাছ।

রাত্রে একমাত্র আলো জ্বলতো ধনীদের ঘরে। মোমবাতির ব্যবহার বিলাসিতা বলে মনে করা হতো। মানুষের জীবনে আমোদ-প্রমোদের বিশেষ সুযোগ ছিল না। অভিজাত সামন্তদের নিয়মিত ভাবে শিকারে যাওয়া ও নানা প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান করাই ছিল জীবনের অঙ্গ।

সামন্ত প্রভুরা মানুষের শিক্ষা-দীক্ষা বা বুদ্ধিবৃত্তির চেয়ে দৈহিক শক্তিকে

বেশী সম্মান করতেন। সামন্তদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন নিরক্ষর। সুতরাং সামন্ত দুর্গের মধ্যে সাংস্কৃতিক জীবন ছিল অত্যন্ত নিচু মানের। এদের পরিচয়ের একমাত্র ভিত্তি ছিল বংশগৌরব, আর পূর্বপুরুষের সামরিক কৃতিত্ব।

শিভ্যালরি বা নাইট প্রথা : 'শিভ্যালরি' শব্দের মূল অর্থ অশ্বারোহীর দল। সামন্ত প্রথার এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ছিল **শিভ্যালরি** নামক বিশেষ আচরণবিধি। যাঁরা এই বিধি ভালভাবে আয়ত্ত করতেন তাঁরা **নাইট** উপাধি পেতেন। নাইট হওয়া সে যুগে বিশেষ সম্মানের ব্যাপার ছিল।



নাইট

সামন্ততান্ত্রিক সমাজে প্রথম জীবনে সম্ভ্রান্ত-বংশীয় ছেলেরা কোন বীর বা যোদ্ধার সঙ্গে ঘুরে বেড়াত। এই বালক ভৃত্য বা 'পেজ' বড় হয়ে 'স্কোয়ার' হতো ও যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করতো। লেখাপড়া তেমন না শিখলেও ঘোড়ায় চড়া, শিকার কৌশল ও অস্ত্রের ব্যবহার এবং দেহ ও মনের সাহস অর্জন ইত্যাদি ছিল শিক্ষার অবশ্য বিষয়। শিক্ষার্থীকে অবশ্যই শিষ্টাচার শিখতে হতো। তারপর উপযুক্ত বিবেচিত হলে রাজা বা কোন বীর তাদের নাইট উপাধিতে ভূষিত করতেন। নাইট হতে গেলে আগের দিন উপবাসী থেকে দেহ মন শুদ্ধ করে তরবারি হাতে নিয়ে প্রার্থনা করতে হতো। তারপর পৃষ্ঠপোষক রাজা বা অন্য কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি প্রার্থীর কাঁধে তরবারির উল্টো দিক দিয়ে মৃদু আঘাত করে তাকে নাইট বলে সম্বোধন করলেই সে নাইটের স্বীকৃতি পেত।

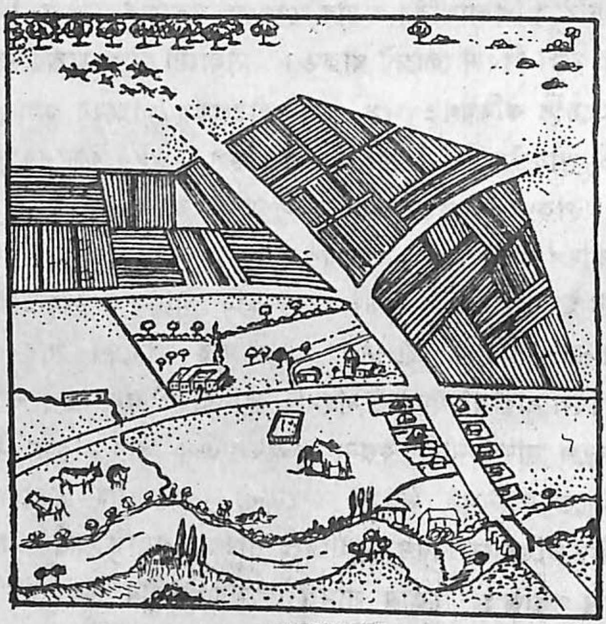
নাইট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে কতকগুলি নিয়ম মেনে চলতে হতো এবং দায়িত্ব পালনে কতকগুলি অঙ্গীকার করতে হতো। নাইটের প্রধান ধর্ম ছিল সর্বদা সত্য কথা বলা, দুঃস্থ ও বিপদাপন্ন ব্যক্তিদের সাহায্য করা, নারী-জাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, শত্রুর নিকট নতি স্বীকার না করা। এই সব রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহারকে এক কথায় বলা হয় **শিভ্যালরী**। কোন নাইটের চরিত্রে শিভ্যালরির অভাব দেখলে সকলেই তাকে নিন্দা করত। নাইটদের মধ্যে বিবাদ লেগেই থাকত। মীমাংসা হতো যুদ্ধের মাধ্যমে।

ট্রুবাদোর কবিগণ ঃ সে যুগের বীরধর্মের গৌরবের কথা ও আদর্শবান নাইটদের শৌর্যবীর্যের গল্প খুবই জনপ্রিয় ছিল। দেশবিদেশের চারণ কবিরা বীরত্বপূর্ণ উপকথা অবলম্বন করে গান রচনা করত ও তা গেয়ে বেড়াত। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দী হতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত দক্ষিণ ফ্রান্স, উত্তর স্পেন এবং উত্তর ইতালিতে এই শ্রেণীর চারণ কবি আবির্ভূত হয়েছিলেন। এঁরা ট্রুবাদোর নামে পরিচিত ছিলেন। ট্রুবাদোর কবিদের আর একটি প্রিয় বিষয়বস্তু ছিল নারীর মর্যাদা ও মহিমা। কবিরা সৌন্দর্য, মহত্ত্ব ও কমনীয়তার প্রতিমূর্তিরূপে আদর্শ নারী কল্পনা করতেন এবং তাঁর মর্যাদা রক্ষায় প্রাণ বিসর্জন দিতে নাইটদের উদ্বুদ্ধ করতেন। মধ্যযুগের ইউরোপের প্রায় দু' শতাব্দীর ইতিহাসে চারশ' ট্রুবাদোর পরিবার খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

ম্যানর পদ্ধতি ঃ কোন সামন্ত প্রভুর অধীন এক একটি গ্রাম বা গ্রামাঞ্চলকে বলা হতো **ম্যানর**। কৃষি ও শিল্পের দিক দিয়ে ম্যানরগুলি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। তাই ম্যানরকে সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রীয় সংগঠন বলা যায়। আসলে সামন্ততন্ত্র ও ম্যানর ব্যবস্থা একই ঐতিহাসিক কারণে গড়ে উঠে। ভূ-সম্পত্তির মালিকানাকে কেন্দ্র করে মধ্যযুগের সমাজে যে অভিজাত সামন্তশ্রেণী গড়ে উঠে, তাদের জমি-জায়গা চাষ করানোর তাগিদ থেকেই ম্যানর ব্যবস্থার জন্ম হয়। সুতরাং মধ্যযুগের সমাজে যে রাজনৈতিক কাঠামো সামন্ততন্ত্র নামে পরিচিত, তারই অর্থনৈতিক রূপটির নাম ম্যানর ব্যবস্থা।

একই সামন্ত প্রভুর অধীনে বহু ম্যানর থাকত। ম্যানরের প্রায় মধ্যস্থলে

থাকত সামন্ত প্রভুর বাসভবন বা প্রাসাদ দুর্গ। একে বলা হতো ম্যানর হাউস। প্রতি ম্যানরে একটি করে গির্জা এবং ধর্মযাজকদের থাকবার জন্য বাড়ি থাকত। ম্যানরে কৃষক ও কারিগরদের থাকবার জন্য সারি সারি কুটীর থাকত। ম্যানরে কৃষি ও অনাবাদী জমি, পশুচারণ ক্ষেত্র ও বনভূমি থাকত।



ম্যানর

বলপ্রয়োগে অধিকৃত কিংবা রাজার স্বেচ্ছায় দেওয়া জমিতে চাষ আবাদের দ্বারা ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা হয়েছিল। জমি চাষ করা হতো সমবায় ভিত্তিতে এবং যারা চাষ করত তারা সামন্তের অধীনে ভূমিদাস বা প্রজা বলে গণ্য হতো। এক বা একাধিক গ্রামকে নিয়ে সুরক্ষিত করে ম্যানর বা খামার তৈরি হতো। এক একটি ম্যানরে ন'শো থেকে দু' হাজার একর পর্যন্ত চাষের জমি থাকত। জমিগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করে এককালীন দু'ভাগ জমিতে চাষ হতো। আর এক ভাগ পতিত রাখা হতো। পরের বছর পতিত জমিতে

চাষ করে অন্য ভাগ ফেলে রাখা হতো। এতে জমির উৎপাদন ক্ষমতা বেশী হতো এবং উর্বরতা শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকত।

ম্যানরের কাজ : সমবায় ভিত্তিতে শস্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস ম্যানরে উৎপন্ন করা হতো। চাষীরা একসঙ্গে জমিতে লাঙ্গল দিত, বীজ বুনত ও ফসল কাটত। সে যুগের লাঙ্গল ও অন্যান্য কৃষিযন্ত্র ছিল অনুন্নত এবং বলদগুলি ছিল খুবই কৃশ। একসঙ্গে অনেকগুলি বলদের সাহায্য ছাড়া শক্ত পাথুরে জমি চাষ করা সম্ভব ছিল না। একক ভাবে কোন চাষী চাষ-আবাদ করতে পারত না। প্রকাণ্ড কৃষিক্ষেত্রের এক বা একাধিক খণ্ডের মালিক ছিল প্রত্যেক চাষী। বাঁধের দ্বারা জমির সীমানা নির্দেশ করা হতো। অধিকাংশ ক্ষেত্রে চাষীদের জমির পাশেই থাকত সামন্তপ্রভুর খাস জমি। চাষীদের বিনা বেতনে প্রভুর এই জমি চাষ করে দিতে হতো। আবার ফসল কাটার মরশুমে চাষীদের অতিরিক্ত সময় প্রভুর জন্য খাটতে হতো।

ম্যানরের প্রশাসনিক ব্যবস্থা : ম্যানর ছিল সামন্ততান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার আঞ্চলিক কেন্দ্র। সামন্তগণ রাজশক্তির কাছ থেকে শাসন-ক্ষমতা লাভ করে দুর্গপ্রাসাদে বাস করতেন। যাদের দুর্গ ছিল না ম্যানরই ছিল তাঁদের বাসস্থান। ম্যানরের কৃষিকাজ পরিচালনা ছাড়া, প্রজাদের অভাব অভিযোগ শুনে তার প্রতিকার করার জন্য তাঁরা সেখানেই এক ধরনের প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতেন। এইজন্য তারা স্টুয়ার্ড, বেলিফ প্রভৃতি কর্মচারী নিয়োগ করতেন। ম্যানরের অন্যান্য কর্মচারীদের মধ্যে 'সুপারভাইজার' ছিলেন প্রধান পরিদর্শক। হেওয়ার্ড নামক কর্মচারিগণ পশুপাখীর উপদ্রবে যাতে শস্য নষ্ট না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতেন। সমস্ত প্রজাদের নিয়ে ম্যানরের হলঘরে, গ্রাম্য চার্চ-বাড়িতে অথবা খোলা জায়গায় গাছের নীচে বিচার সভা বসত। লিখিত আইন না থাকলেও প্রচলিত প্রথা ও উপস্থিত ব্যক্তিদের বিবেচনা অনুযায়ী বিচার করে অপরাধীর শাস্তি প্রদান করা হতো। পরবর্তিকালে প্রচলিত প্রথাগুলিকে লিপিবদ্ধ করে আইনের রূপ দেওয়া হয়। এই আইন প্রত্যেককেই মেনে চলতে হতো। বিচার কালে জরিমানা হিসেবে যে অর্থ আদায় হতো, তা ছিল সামন্তপ্রভুর প্রাপ্য।

ম্যানরের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা : কৃষক প্রজাদের দিয়ে চাষ-আবাদের মাধ্যমে খাদ্যশস্য উৎপাদন করাই ছিল ম্যানরের প্রধান কাজ। জীবন-ধারণের উপযোগী প্রায় সব জিনিসই ম্যানরের ভিতরে উৎপন্ন হতো। ম্যানরে উৎপন্ন বাড়তি খাদ্যশস্য বাজারে বিক্রয় করা হতো। ম্যানরবাসী স্ত্রীলোকেরা পশম রং করত এবং তাঁতে কাপড় বুনত। পুরুষেরা চামড়া দিয়ে জুতো, ঘোড়ার লাগাম প্রভৃতি তৈরি করত। ম্যানরের ভিতরে থাকত গম কল, রুটি তৈরীর কারখানা ও পানীয় তৈরীর ব্যবস্থা। এই সব কল-কারখানার মালিক ছিল সামন্তপ্রভু। প্রত্যেক ম্যানরবাসীকেই ঐ কলে তৈরী জিনিস অবশ্যই ব্যবহার করতে হতো। অন্যথায় শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা হতো।

ম্যানর পদ্ধতিতে চাষীদের অবস্থা : এক একটি ম্যানরে চাষীদের অবস্থা দুটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল ছিল। যেমন, (১) তাদের ব্যক্তিগত মর্যাদা এবং (২) তাদের জমির অধিকার। ভূমিদাসগণ উত্তরাধিকার সূত্রে জমির বন্দোবস্ত পেত, এবং কোন ভূমিদাসের সন্তান ভূমিদাসরূপেই জন্মগ্রহণ করত। ভূমিদাস ও মুক্ত স্ত্রীলোকের মধ্যে বিবাহের ফলে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করত সেও ভূমিদাস হতো। তবে এরূপ বিবাহে পুরুষের মর্যাদা খানিকটা বৃদ্ধি পেত। ত্রয়োদশ শতাব্দীর ভূমিদাসগণ কোন অংশেই ক্রীতদাসের চেয়ে উন্নত ছিল না। আইনতঃ তারা ছিল প্রভুর সম্পত্তি। তারা কোন সম্পত্তির মালিক হতে পারত না। তাদের ক্রীতদাসের ন্যায় বিক্রয় করা যেত এবং অনেক ক্ষেত্রেই তাদের প্রত্যেকের মূল্য একটি উৎকৃষ্ট ঘোড়ার মূল্য অপেক্ষা বেশী ছিল না। আইন তাদের ব্যক্তিরূপে কোন স্বীকৃতি দেয়নি। কোন ভূমিদাস তার ইচ্ছামত কোন কাজ করতে পারত না। এমন কি, এক ম্যানর থেকে অন্য ম্যানরে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। বহু শতাব্দীর রীতিনীতি, ভূমিদাসদের স্বাধীনতা অভাবনীয় রূপে সীমাবদ্ধ ও সংকুচিত করেছিল।

কঠোর সামন্ত নীতি অনুসারে সামন্ত প্রভুর ইচ্ছা অনুসারে ভূমিদাসদের উপর নানারকম কর ধার্য করা হতো। স্থানীয় প্রথা অনুসারে করের পরিমাণ নির্ধারিত হতো, এবং টাকা বা ফসলের দ্বারা তা পরিশোধ করা যেত। প্রভুর

প্রতি আনুগত্যের নিদর্শন স্বরূপ প্রত্যেক প্রজাকেই ক্যাপিটেশন নামক কর দিতে হতো। এছাড়া টেইলি নামক সম্পত্তি কর, হেরিয়েট নামক উত্তরাধিকার কর প্রজাদের দিতে হতো। তাছাড়া প্রধান প্রধান উৎসবগুলির সময়ও ভূমিদাসদের কিছু কিছু অর্থ রীতি অনুসারে দিতে হতো। শস্য চূর্ণ করবার যন্ত্র, রুটি স্যাঁকবার যন্ত্র, মদ্য প্রস্তুত করবার ভাঁটি, গ্রাম্য কূপ প্রভৃতি ব্যবহার করবার জন্য ভূমিদাসদের সামন্তপ্রভুকে 'ব্যানালিটিজ' নামক কর দিতে হতো। সেতু ও রাস্তা ব্যবহার করবার জন্য সামন্তপ্রভু ভূমিদাসদের কাছ থেকে কর আদায় করতেন। এছাড়া সামন্তপ্রভুর মদ্য বিক্রয়ের একচেটিয়া অধিকার ছিল, এবং কৃষকদের সেই মদ্য বাধ্যতামূলক ভাবে কিনতে হতো। সামন্তপ্রভুর মত চার্চকেও নানারকম কর দিতে হতো। টিথ্‌স নামক ধর্মকর এবং 'মরচুয়ারি' নামক সৎকার কর এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

পুরুষ-প্রজাদের বিবাহ এবং স্ত্রী-প্রজাদের বিবাহের পর অন্য ম্যানরে যোগদানের অনুমতির বিনিময়ে সামন্তপ্রভু তাদের নিকট থেকে বিশেষ কর আদায় করতেন।

দুর্গে সামন্তদের জীবনযাত্রা : ধনী সামন্তদের অনেকের দুর্গ থাকলেও অপেক্ষাকৃত গরীবদের মত তাঁরাও ম্যানর বাড়িতে বাস করতেন। এজন্য ম্যানর বাড়িকে যথাসম্ভব সুরক্ষিত ও আরামদায়ক করে তোলা হতো। তা সত্ত্বেও আধুনিক যুগের সাধারণ জীবনযাত্রার মানের তুলনায়ও তাদের ম্যানর জীবনকে অতি কষ্টকর বলে মনে হয়। ম্যানর বাড়ি তৈরি হতো কোন উঁচু জায়গা বা টিলার উপর সবচেয়ে সুবিধাজনক জায়গায়। এতে তিনটি তলা থাকত। সবচেয়ে নীচের তলায় বাসনপত্র, খাদ্য ও পানীয় দ্রব্য ইত্যাদি রাখা হতো। সামন্তদের শোয়ার ঘর, বৈঠকখানা প্রভৃতি থাকত দোতলায়। দোতলা ও তিনতলায় একটি করে রান্নাঘর থাকত। ছোটদের জন্য আলাদা ঘর থাকত। কেউ আসলে বসবার জন্য একটি অভ্যর্থনা কক্ষ থাকত। এই ঘর সামন্তপ্রভু ও তাঁর পরিবারের সকলের প্রার্থনার জন্যও ব্যবহার করা হতো। আসবাব-পত্রের বিশেষ বাহুল্য ছিল না। একটি টেবিল, কয়েকখানি

চেয়ার অথবা বেঞ্চি দিয়ে হলঘর সাজানো হতো। তৈজসপত্র বলতে ছিল কিছু পিতলের বাসন, বাতিদান, হাঁড়ি-কড়াই ইত্যাদি। ম্যানর বাড়ির কাছেই থাকত গ্রাম্যচার্চ। ম্যানরের ভিতর কেবল এই দুটিই ছিল পাকা বাড়ি।

সামাজিক শ্রেণীবিভাগ : সামাজিক দিক দিয়ে ম্যানরবাসীদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—অভিজাত, যাজক ও প্রজা। সামন্তপ্রভু ও তাঁর পরিবারের লোকেরা অভিজাত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ম্যানরের মালিক হিসেবে সামন্তপ্রভু সব রকমের সুখ-সুবিধা ভোগ করতেন। তিনি ছিলেন সর্বময় কর্তা এবং বিশেষ সামাজিক মর্যাদার অধিকারী। ম্যানরের সঙ্গে যে চার্চ থাকত, তার যাজকগণও নানা রকমের সুখভোগ করতেন। মর্যাদার দিক দিয়ে তাঁরাও ছিলেন সম্মানিত। কৃষক ও শ্রমিক প্রজারা ছিল সংখ্যায়



সামন্ততান্ত্রিক যুগে তিন সম্প্রদায়—যাজক, অভিজাত ও প্রজা

অনেক। সমাজে তারা ছিল অবহেলিত, শোষিত ও নির্যাতিত। সামাজিক দিক দিয়েও এদের স্থান ছিল সকলের নীচে। জীবনযাত্রার মানের বিচারে অভিজাতগণের সঙ্গে প্রজাদের পার্থক্য ছিল বিরাট। জনসাধারণের মধ্যে এক শ্রেণীর চাষী ছিল 'ভিলেন' বা স্বাধীন চাষী। তারা তাদের ফসলের এক অংশ জমিদারকে দিত। মাঠ ও জঙ্গল থেকে শাক-সবজি, জ্বালানি কাঠ ইত্যাদি জমিদার প্রভুর বাড়ি পৌঁছে দিত। জমিদারদের কাজ শেষ করে ভিলেনগণ স্বাধীন ভাবে চলাফেরা করত।

ম্যানরবাসীদের ব্যবহারের জিনিসপত্র ও যন্ত্রপাতি ম্যানরেই তৈরি হতো। চাষী ব্যতীত প্রত্যেক ম্যানরে কামার, কুমোর প্রভৃতি কারিগর শ্রেণীর লোক ছিল। প্রতি ম্যানরে একটি করে স্বতন্ত্র সমাজ গড়ে উঠেছিল। আমাদের

দেশের চারণদের মত মধ্যযুগেও এক শ্রেণীর লোক ছিল, তারা ম্যানরে গান ও ছড়া গেয়ে বেড়াত। ম্যানরবাসীরা তাদের মুখে নানাপ্রকার খবর জানতে পারত। এই খবরের অধিকাংশই থাকত ভিত্তিহীন।

ম্যানর জীবন থেকে মুক্তির উপায়ঃ মধ্যযুগের ইউরোপের প্রায় সব দেশেই সাধারণ কৃষক ও ভূমিদাসদের অবস্থা ছিল দুর্বিসহ। এই দুঃসহ ম্যানর জীবন থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য প্রজারা নানাভাবে চেষ্টা করত। অবশেষে তাদের মুক্তি তারা নিজেরাই এনেছিল। পুরানো ও নতুন শহর-গুলিতে বাণিজ্য ও শিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, উন্নত রাস্তাঘাট ও সেতু তৈরি হওয়ার ফলে কৃষি উৎপাদনের চাহিদা বিশেষভাবে বেড়ে যায়। শহরে কৃষিজাত শস্যের চাহিদা ভূমিদাসদের অতিরিক্ত আয়ের পথ প্রশস্ত করে দেয়। ভূমিদাসদের মধ্যে অনেকে এই ভাবে অর্থ সঞ্চয় করে সেই অর্থের বিনিময়ে মালিকদের কাছ থেকে নিজেদের মুক্ত করে। ইউরোপের সর্বত্র জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় নতুন বসতির জন্য স্থান পরিষ্কার, জলাভূমি পুনরুদ্ধার প্রভৃতি কাজে অগ্রণী কৃষকশ্রেণীর মানুষ নতুন বৃত্তি গ্রহণ করে নতুন অঞ্চলে বসবাস করে মুক্তিলাভ করে। তাছাড়া প্রভুর অনুমতি নিয়ে কিছু ভূমিদাস পবিত্র সংস্থাগুলিতে যোগদান করে মুক্তিলাভ করে। আবার কিছু লোক শহরে পালিয়ে যায় এবং শহরের নিরাপত্তার সুযোগে বাণিজ্য ও শিল্পে নিজেদের নিয়োজিত করে। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রথম ক্রুসেডে হাজার ভূমিদাস যোগ দেয়। রোমাঞ্চকর ও গৌরবজনক মুক্তির এইরূপ অভূতপূর্ব সুযোগ তারা সহজেই গ্রহণ করে। খৃষ্টীয় চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে ধনশালী ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে শেষ অত্যাচারিত মানুষ বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং প্রভুর কাছ থেকে জোর করে মুক্তি আদায় করে।

কালপঞ্জী

সামন্ততন্ত্রের বিকাশ—নবম, দশম ও একাদশ শতাব্দী।
সামন্তপ্রথার বিলোপ—পঞ্চদশ শতক।

অনুশীলনী

মৌখিক প্রশ্ন ❋ ❋ ❋ **এক নম্বর**

১. সামন্তপ্রথার উৎপত্তি কখন থেকে হয়? ২. মুখ্য প্রজা কাদের বলা হতো? ৩. মধ্য প্রজা বলতে কি বোঝ? ৪. সামন্ত দুর্গগুলি কোথায় তৈরি হতো? ৫. ম্যানর কাকে বলে? ৬. নাইট কাকে বলে? ৭. ট্রুবাদোর কবিরা কি করত? ৮. ক্যাপিটেশন কি?

সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন ❋ ❋ ❋ ❋ ❋ ❋ **৩ নম্বর**

১. সামন্তপ্রথা কাকে বলে? এই প্রথার সৃষ্টি কিভাবে হয়েছিল? [১+২]
২ সামন্তপ্রথায় কিভাবে রাজা তাঁর ক্ষমতা হস্তান্তর করতেন? [৩]
৩. কোন্ চুক্তিতে প্রজাদের মধ্যে জমি বিলি-বন্দোবস্ত দিতেন? [৩]
৪. সামন্ত দুর্গ কি জন্য তৈরী হতো? [৩]
৫. নাইট হতে হলে কি কি যোগ্যতার প্রয়োজন হতো? [৩]
৬. সামন্ততন্ত্রে মানুষ কয় শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল? কি কি? [২+১]

রচনাত্মক প্রশ্ন ❋ ❋ ❋ ❋ ❋ ❋ ❋ **৯ নম্বর**

১. সামন্তপ্রথা কি? কিভাবে এই প্রথায় উৎপত্তি হয়েছিল? [২+৭]
২. সামন্তপ্রথার সামাজিক রূপ সংক্ষেপে আলোচনা কর। [৯]
৩. সামন্ত শাসনে অশ্বারোহী সৈন্যের ভূমিকা আলোচনা কর। [৯]
৪. সামন্তযুগে ইউরোপের জীবনযাত্রা সংক্ষেপে আলোচনা কর। [৯]
৫. নাইটপ্রথা কাকে বলে? নাইট উপাধি লাভ করার পদ্ধতি বর্ণনা কর? [২+৭]
৬. ম্যানরকে সামন্ততান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার সংগঠন বলার যুক্তি সংক্ষেপে আলোচনা কর। [৯]
৭. ম্যানরের অর্থনৈতিক অবস্থা আলোচনা কর। [৯]
৮. ম্যানর পদ্ধতিতে চাষীদের জীবনের চিত্র বর্ণনা কর। [৯]
৯. ম্যানরের করনীতি বর্ণনা কর। [৯]
১০. ম্যানর জীবন থেকে কৃষকরা কি ভাবে অব্যাহতি পেত? [৯]



অষ্টম অধ্যায়

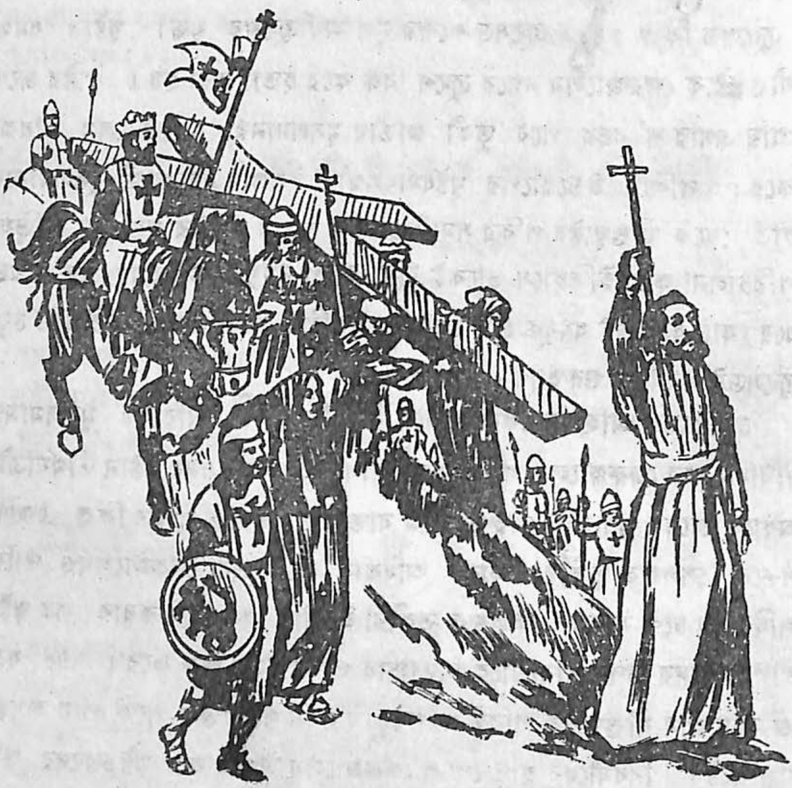
ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ

ক্রুসেড কি ? : ক্রুসেড শব্দের মূল অর্থ ক্রুশের যুদ্ধ। খৃষ্টান ধর্মগুরু যীশুখৃষ্টকে জেরুজালেম নগরে ক্রুশে বিদ্ধ করে হত্যা করা হয়। খৃষ্টের জন্মের প্রায় এগার শ' বছর পরে তুর্কী জাতীয় মুসলমানরা জেরুজালেম অধিকার করে। পশ্চিম ইউরোপের খৃষ্টধর্মাবলম্বীরা ইসলাম ধর্মাবলম্বী মুসলমানদের হাত থেকে যীশুখৃষ্টের পবিত্র সমাধিস্থানকে উদ্ধার করবার জন্য যে অভিযান পরিচালনা করে ইতিহাসে তাকেই **ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ** বলা হয়। দু'শ বছর ধরে ষাট বার এই ধর্মযুদ্ধ হয়েছিল। সেগুলির মধ্যে প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ ক্রুসেডই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

ক্রুসেডের আহ্বান কেন জানান হয়েছিল ? : আরবের মুসলমানগণ দীর্ঘদিন ধরে জেরুজালেম শাসন করে আসছিল। এই সময় খৃষ্টান তীর্থযাত্রীরা অবাধে তাদের পুণ্যতীর্থ জেরুজালেমে যাতায়াত করতে পারত কিন্তু একাদশ শতকে সেলজুক তুর্কীরা আরব অধিকার করে এবং জেরুজালেমও তাদের অধিকারে চলে যায়। সেলজুক তুর্কীরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর খৃষ্টান তীর্থযাত্রীদের উপর নানাভাবে অত্যাচার ও উৎপীড়ন শুরু করে। এর ফলে জেরুজালেমে যীশুখৃষ্টের পবিত্র সমাধিভূমি দর্শন খৃষ্টভক্তের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। বিধর্মীদের হাত থেকে জেরুজালেম উদ্ধার করে খৃষ্টভক্তদের তীর্থ দর্শনের সুযোগ করে দেওয়াই ছিল ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ আহ্বানের মুখ্য উদ্দেশ্য।

ক্রুসেডের প্রস্তুতি : একাদশ শতাব্দীর শেষদিকে ইউরোপের দেশগুলিতে এক অসাধারণ ধর্মীয় উন্মাদনা দেখা দেয়। এই সময় খৃষ্টান তীর্থযাত্রীদের উপর সেলজুক তুর্কীদের অকথ্য অত্যাচারের কাহিনী ইউরোপের সর্বত্র প্রচারিত হয়। ফলে রোমের পোপ এক মহাসভা আহ্বান করে মুসলমানদের হাত থেকে পুণ্যভূমি জেরুজালেম উদ্ধার করবার আহ্বান জানান। পোপের এই আবেদনে সাড়া দিয়ে তুর্কীদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড বা—

সশস্ত্র অভিযানে এগিয়ে আসেন রাজা, সামন্তসর্দার, নাইট এবং দলে দলে স্বেচ্ছাসেবী সৈনিক। মাঝে মাঝে কিছুদিন বন্ধ থাকলেও প্রায় দু'শ বছর ধরে ক্রুসেড অভিযান চলেছিল। মোট আটটি ক্রুসেড ঐতিহাসিকদের মতে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তার মধ্যে আবার প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ ক্রুসেড



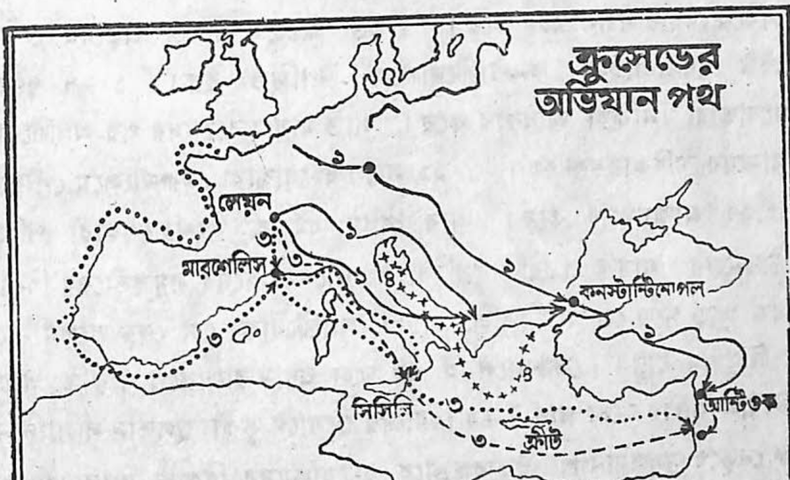
ক্রুসেডের অভিযান

ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাইজান্টাইন সম্রাট আলেক্সিয়াসের অনুরোধে পোপ দ্বিতীয় আরবান ক্রুসেডের সূচনা করেন।

প্রথম ক্রুসেড : ১০৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ক্লারমন্টের ধর্মীয় অধিবেশনে প্রথম ক্রুসেডের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তুর্কীদের অকথ্য অত্যাচারের বিবরণ দিয়ে পোপ বললেন—'বিধর্মীদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধে যোগ দাও, বিপুল পরিমাণ

লুণ্ঠিত সম্পদ ভোগ করতে পারবে। বিধর্মীদের দেশে দুধ আর মধু প্রবাহিত হচ্ছে। দস্যুরা যোদ্ধা হও, সমস্ত পাপ দূর হয়ে যাবে। এখানে যারা দরিদ্র ও দুর্দশাগ্রস্ত, বিধর্মীদের দেশে তারাই হবে ধনী ও সুখী মানুষ।'

ইউরোপের মানুষকে পোপ যে এভাবে উত্তেজিত করেছিলেন তার পেছনে আরও অনেক কারণ ছিল। একাদশ শতকের শেষদিকে নানা প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক কারণে সাধারণ মানুষের মনে প্রচণ্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল। এই অশান্ত পরিবেশকে শান্ত করবার উদ্দেশ্যেই পোপ দ্বিতীয় আরবান বিক্ষুব্ধ মানুষের মনে ধর্মযুদ্ধের উন্মাদনা সৃষ্টি করে তাদের ইউরোপ



থেকে প্রাচ্যদেশে পাঠাতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই তিনি খুব সুকৌশলে তাদের সামনে তুলে ধরেছিলেন সুখসমৃদ্ধি ও সকল পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার বিরাট প্রলোভন।

যা হোক আরবানের বক্তৃতায় শ্রোতারা অভিভূত হয়ে ধর্মযুদ্ধে যোগদানের শপথ গ্রহণ করে। হাজার হাজার মানুষ ক্রুশ হাতে এগিয়ে আসে। প্রথম ক্রুসেডে কোন রাজা যোগ দেননি সত্য, কিন্তু লোরেনের ডিউক গডফ্রে, নর্মাণ্ডির ডিউক রবার্ট প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত বীরগণ অংশগ্রহণ করায় ধর্মযোদ্ধাদের

মনোবল বেড়ে গিয়েছিল। এঁদের নেতৃত্বে ইউরোপের দরিদ্র কৃষক সম্প্রদায়, শোষিত শ্রমিকগণ এবং সর্বশ্রেণীর মানুষ নিয়ে গঠিত বিশাল বাহিনী ফ্রান্সের উত্তর পূর্বাঞ্চল এবং পশ্চিম জার্মানী থেকে দানিয়ুব নদীর অববাহিকা ধরে প্রথমে হাঙ্গেরীতে উপস্থিত হয়। অভিযানকারীদের কাছে না ছিল অস্ত্রশস্ত্র, না ছিল পর্যাপ্ত খাদ্য। তার উপর ছিল শৃঙ্খলার অভাব। তাই চলার পথে তারা ভিক্ষা করে, কখনও চুরি আবার কোন সময় ডাকাতি ও রাহাজানি করে জীবন বাঁচায়। অভিযাত্রীরা কনস্টান্টিনোপলে পৌঁছে বাইজান্টাইন সম্রাট আলেক্সিয়াসকে তাঁর রাজ্যাংশ মুসলমানদের হাত থেকে উদ্ধার করে ফিরিয়ে দেবার শপথ গ্রহণ করে। ১০৯৬ খ্রীষ্টাব্দে সামন্ত প্রভুদের নেতৃত্বে নাইট সেনাবাহিনী কনস্টান্টিনোপলে উপস্থিত হয়। ১০৯৭ খৃষ্টাব্দে ধর্মযোদ্ধারা 'নিকিয়া' অধিকার করে। সাত মাস অবরোধের পর অ্যান্টিয়োক খৃষ্টানদের অধিকারভুক্ত হয়। ১০৯৯ সালে ধর্মযোদ্ধারা জেরুজালেমে পৌঁছুলে তুর্কীগণ আত্মসমর্পণ করে। আর প্রথম ধর্মযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী পশ্চিম ইউরোপের সামন্ত প্রভুরা সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনের সমুদ্রতীরের বিশাল ভূখণ্ড জুড়ে গড়ে তোলে ত্রিপলি, এডেসা, অ্যান্টিয়োক এবং জেরুজালেম নামে চারটি খৃষ্টান রাষ্ট্র। জেরুজালেমই এর মধ্যে প্রধান রাজ্যরূপে স্বীকৃতি পায়। এই রাজ্যগুলির মধ্যে স্বার্থ নিয়ে বিবাদের সুযোগে তুর্কী সুলতান সালাদিনের দক্ষ নেতৃত্বে মুসলমানগণ ঐক্যবদ্ধভাবে ধর্মযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করে এবং ১১৮৭ খৃষ্টাব্দে তাদের হাত থেকে জেরুজালেম ছিনিয়ে নেয়। এরপর জেরুজালেম পুনরুদ্ধারের জন্য পরিচালিত হয় পশ্চিম ইউরোপের খৃষ্টভক্ত সামন্ত-প্রভুদের তৃতীয় ক্রুসেড অভিযান।

তৃতীয় ক্রুসেড: জেরুজালেম রাজ্যের পতনের ফলে নূতন করে অভিযান পাঠাবার প্রয়োজন অনুভূত হয়। জার্মান-রাজ ফ্রেডারিক বারবারোসা তাঁর সুশৃঙ্খল জার্মান বাহিনী নিয়ে ১১৮৯ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ শুরু করেন। ফ্রেডারিকের আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৃত্যুতে তাঁর সেনাবাহিনীর অনেকে দেশে ফিরে যায়। অবশিষ্ট সৈন্যগণ ইংরেজ ও ফরাসী বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। এরপর ইংলণ্ডের অধিপতি প্রথম

রিচার্ড এবং ফরাসী নরপতি ফিলিপ অগাস্টাসের নেতৃত্বে তৃতীয় ক্রুসেড পরিচালিত হয়। এই দুই রাজার মধ্যে সদ্ভাব না থাকায় তাঁরা প্রথম থেকেই কলহ বিবাদে মেতে উঠেন। ফলে এঁরা কয়েকটি স্থান অধিকার করলেও জেরুজালেম অধিকার করতে পারেন নি। ফিলিপ অগাস্টাস সামান্য অজুহাতে দেশে ফিরে যান। তখন রিচার্ড বাধ্য হয়ে তুর্কী সুলতান সালাদিনের সঙ্গে তিন বছরের জন্য এক চুক্তি স্বাক্ষর করলেন। এই চুক্তির শর্ত অনুসারে তীরভূমির এক খণ্ড জমিতে জেরুজালেমের রাজার কর্তৃত্ব স্বীকার করা হয়, এবং খৃষ্টানদের অবাধে জেরুজালেমে প্রবেশ করবার অধিকার মেনে নেওয়া হয়। তৃতীয় ক্রুসেড তাই জেরুজালেম উদ্ধারের ব্যর্থ প্রচেষ্টার নামান্তর ছাড়া কিছুই নয়।



ফ্রেডারিক বারবারোসা

চতুর্থ ক্রুসেড : তৃতীয় ক্রুসেড খৃষ্টানদের পক্ষে লাভজনক না হওয়ায় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পোপ তৃতীয় ইনোসেন্ট আবার এক ধর্মযুদ্ধের আহ্বান জানান। এই আহ্বানে কোন রাজা সাড়া দেননি। কিন্তু এই অভিযানে ফরাসী অভিজাত শ্রেণী এবং নাইটরা যোগদানের জন্য এগিয়ে আসে। এদের সঙ্গে যোগ দেয় ইংরেজ, জার্মান ও সিসিলীর সেনাবাহিনী। এরা স্থলপথে না গিয়ে জলপথে যাবার জন্য ইতালির ভেনিসবাসী বণিকদের কাছে জাহাজ ভাড়া করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। ভেনিসের বণিকরা অর্থের

বিনিময়ে তাদের খাদ্য ও পারাপারের জন্য জাহাজ দিতে রাজী হলো। ধর্মযোদ্ধারা ভেনিসের পাওনা মেটাতে খৃষ্টান শাসিত জারা শহরটি তাদের হাতে তুলে দিল। এরপর ধর্মযোদ্ধারা বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের গৃহবিবাদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। খৃষ্টান সৈন্যরা পর পর দু'বার কনস্টান্টিনোপল লুণ্ঠন করে। লুণ্ঠনের নেশায় বর্বর খৃষ্টান নাইটরা সেন্ট সোফিয়া চার্চের বেদীটিকে মূল্যবান পাথরের লোভে চূর্ণ বিচূর্ণ করে। বহু শতাব্দীর প্রাচীন অমূল্য চিত্রকলা এবং ভাস্কর্যগুলিও তাদের বর্বরতায় ধ্বংস হয়ে যায়। এই লুণ্ঠনে ধর্মযোদ্ধাবেশী বিশপ ও যাজকরাও অংশ গ্রহণ করে। এইভাবে জেরুজালেম উদ্ধারের পরিবর্তে প্রাচ্যের সবচেয়ে সমৃদ্ধ একটি খৃষ্টান নগর দখল ও তার ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করে সেখানেই অবস্থান করতে থাকে চতুর্থ ক্রুসেডের অভিযানকারীরা।

ক্রুসেডের উদ্দেশ্য : প্রায় দু'শ বছরের ধর্মযুদ্ধে ইউরোপের বিভিন্ন স্তরের মানুষ বিভিন্ন রকমের উদ্দেশ্য নিয়ে যোগ দিয়েছিল। যেমন—

[এক] **ধর্মের প্রেরণা :** পূর্বেই বলা হয়েছে জেরুজালেম খৃষ্টানদের পবিত্র তীর্থস্থান। চতুর্থ শতাব্দী থেকে দলে দলে ইউরোপীয় খৃষ্টান পুণ্য লাভের আশায় জেরুজালেমে যেত। ১০৭৬ খৃষ্টাব্দে সেলজুক তুর্কীরা জেরুজালেম অধিকার করে নেয়। এরপর থেকে খৃষ্টান তীর্থযাত্রীদের উপর শুরু হয় অত্যাচার। এই অত্যাচারের কাহিনী তীর্থযাত্রীদের মুখে মুখে সারা ইউরোপের খৃষ্টভক্ত মানুষ জানতে পারে। খৃষ্টান ধর্মের উপর ইসলামের এই অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে ক্রুসেড শুরু হয়। তাই পোপ দ্বিতীয় আরবানের উদাত্ত আহ্বানে ধর্মপ্রাণ খৃষ্টানরা ধর্মযুদ্ধে যোগদানের জন্য টুকরো কাপড় দিয়ে ক্রুশ তৈরী করে সেটা পোশাকের সঙ্গে এঁটে নেয়। এই ক্রুশ বহন করা থেকেই জেরুজালেম অভিযানকারীদের নাম হয় ক্রুসেডার এবং অভিযানকে বলা হয় ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ।

[দুই] **চার্চের ক্ষমতার সদ্‌ব্যবহার :** ক্লুনির সংস্কার আন্দোলনের পর থেকে দুর্নীতিমুক্ত চার্চের উপর জনগণের আস্থা ফিরে আসে এবং চার্চও স্বাধীনভাবে গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করবার অধিকার ফিরে পায়।

একাদশ শতাব্দীর পোপরা যেমন ছিলেন আত্মবিশ্বাসী তেমনি ছিলেন উদ্ধত। তাঁদের নেতৃত্বে চার্চ যে কোন কঠিন কাজে ব্রতী হতে ইতস্ততঃ করত না। খৃষ্টধর্মের অপমানের সংবাদে খৃষ্টান চার্চ খুবই অপমানিত বোধ করে এবং চার্চের পবিত্র কর্তব্য হিসাবেই পোপ দ্বিতীয় আরবান সশস্ত্র অভিযানের সংকল্প ঘোষণা করেন।

[তিন] **পোপের ব্যক্তিগত মর্যাদা বৃদ্ধির উদ্দেশ্য ঃ** আধুনিক কালের ইতিহাসবিদ্‌রা মনে করেন, পোপের ধর্মযুদ্ধের আহ্বানের পেছনে তাঁর ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যই ছিল মুখ্য, ধর্মের আবেদন গৌণ। চার্চের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী পোপ চার্চ তথা নিজের মর্যাদা বাড়ানোর উদ্দেশ্যেই ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। ধর্মযোদ্ধাদের উপর কর্তৃত্ব এবং অর্থ তহবিল নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা পাবার লোভ যে পোপের মধ্যে ছিল না তা সঠিক ভাবে বলা যায় না।

[চার] **বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্য উদ্ধারের আশা ঃ** বাইজাণ্টাইন সম্রাট আলেক্সিয়াস তাঁর হৃত সাম্রাজ্যাংশ পুনরুদ্ধারের আশায় ধর্মযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। দীর্ঘকাল ধরে মুসলিম আক্রমণ প্রতিরোধ করায় বাইজাণ্টাইন সম্রাট সামরিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। তুর্কীরা যে সব অঞ্চল অধিকার করে নিয়েছিল, বাইজাণ্টাইন সম্রাটের পক্ষে এককভাবে তা পুনরুদ্ধার করা আদৌ সম্ভব ছিল না। ক্রুসেডের মাধ্যমে তিনি ইউরোপের মিলিত শক্তিকে তাঁর সাম্রাজ্য উদ্ধারের কাজে লাগাতে মনস্থ করেছিলেন।

[পাঁচ] **বন্দর কর্তৃপক্ষের রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থ ঃ** ইতালির বন্দর-শহরগুলি নিতান্তই রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ক্রুসেডের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিল। রোম সাম্রাজ্যের গৌরবের দিনে ভেনিস, জেনোয়া, পীসা বন্দরগুলি আন্তর্জাতিক সমুদ্র বাণিজ্যে প্রসার লাভ করেছিল। নবম ও দশম শতাব্দীতে তুর্কী মুসলমানগণ সিসিলি, সার্ডিনিয়া ও বালিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করে, ভূমধ্যসাগরের পথে ইউরোপীয় বাণিজ্য অচল করে দেয়। নিরুপায় হয়ে বন্দর কর্তৃপক্ষ বাইজাণ্টাইন সম্রাট ও নর্মান সেনাপতিদের সাহায্যে জলপথের নিরাপত্তা রক্ষায় অগ্রসর হয়। তাদের এই প্রচেষ্টা

আংশিক সফলও হয়েছিল। জলপথে ক্রুসেড অভিযান চালাবার সিদ্ধান্ত হলে ধর্মযুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী রাজা ও সামন্তদের কাছ থেকে বন্দরগুলি এই সুযোগে সহায়তার বিনিময়ে যেমন প্রচুর অর্থ লাভ করেছিল, তেমনি স্বায়ত্ত শাসনও আদায় করেছিল।

সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনে ক্রুসেডের প্রভাব ঃ ইউরোপীয় সমাজের উপর ক্রুসেডের প্রভাব গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল। সামন্ততান্ত্রিক ইউরোপের সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল কৃষি। ম্যানর-ব্যবস্থায় পরিচালিত কৃষিকাজে অসংখ্য মানুষ নানাভাবে দায়বদ্ধ হয়ে পড়েছিল। ক্রুসেডের ডাকে যে সব সামন্ত যোগ দিয়েছিলেন এই সুযোগে তাদের নির্যাতিত প্রজারা স্বাধীন হয়ে যায়। এই সময় ইউরোপীয় সমাজে স্ত্রীলোকের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। তদুপরি ক্রুসেডে যোগদানকারীরা দেশে ফিরে এসে প্রাচ্য দেশের খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ ও রীতিনীতি অনেক কিছুই অনুসরণ করত। এইভাবে ক্রুসেডের প্রভাবে ইউরোপের সমাজের রূপের পরিবর্তন ঘটেছিল।

রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কারণে প্রাচ্য ও পশ্চিমের জাতিগুলির মধ্যে বৈষম্য থাকলেও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তারা পরস্পরকে প্রভাবিত করেছিল। মুসলিম সভ্যতার উন্নত মান ইউরোপীয়দের মুগ্ধ করেছিল। অ্যালকেমি, চিকিৎসাশাস্ত্র, সংগীত প্রভৃতি বিষয়ে প্রাচ্য দেশীয় মুসলমানদের কাছে ইউরোপ শিক্ষালাভ করেছিল। ক্রুসেড উপলক্ষ্যে ইউরোপ ও এশিয়ার মানুষের মনে দুঃসাহসিক ভ্রমণের আগ্রহ বেড়ে যায়। বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক পরিচয়-সূত্রে অনেক ভুল ধারণার অবসান ঘটে।

শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্রের উপর ক্রুসেডের প্রভাব ঃ ক্রুসেড অভিযানের মধ্য দিয়ে ইউরোপের নতুন নতুন শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে উঠে। ইতালিতেই বেশীর ভাগ শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র সম্প্রসারিত হয়েছিল। এদের মধ্যে **ভেনিস, জেনোয়া, পিসা** এবং **অ্যামালফি** প্রাচ্যের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। ভার্সাই প্রভৃতি ফরাসী শহরগুলিও অনুরূপভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত হয়ে সমৃদ্ধ হয়েছিল। চতুর্থ ক্রুসেডের ফলে ভূমধ্য-সাগরের উপর পশ্চিম ইউরোপের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমরূপে কনস্টান্টিনোপলের প্রাধান্যের অবসান হয়। অতঃপর ভেনিস ও জেনোয়ার জাহাজ কৃষ্ণসাগরের পথে রাশিয়া ও মধ্য-এশিয়ার পণ্যসামগ্রী আমদানি করতে থাকে। এশিয়া মাইনর থেকে রেশম দ্রব্য, মশলা ও বিলাস দ্রব্যের আমদানী হয় ইউরোপে। ইউরোপে শিল্পদ্রব্য রপ্তানি হতে থাকে প্রাচ্য দেশগুলিতে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে এইভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণের মূলে ক্রুসেড অভিযানের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

কৃষি ও শিল্পের সম্পর্ক ছেদ: একাদশ শতক থেকেই ইউরোপে কারুশিল্পের বিকাশ শুরু হয়। প্রথম দিকে কারুশিল্পীরা দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাবার উপযোগী জিনিস উৎপাদন করত। এই কাজ তারা কৃষিকার্যের অবসরে করত। পরে তারা সংঘবদ্ধভাবে এক একটি বসতি স্থাপন করে নানাবিধ শিল্পদ্রব্য উৎপাদন করতে থাকে। দ্বাদশ শতকের মধ্যে ক্রুসেড অভিযানের ফলে ইউরোপের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রাচ্য দেশে সম্প্রসারিত হয় এবং এই সব শিল্পদ্রব্যের চাহিদা বিপুল পরিমাণে বেড়ে যায়। তখন একই ব্যক্তির পক্ষে কৃষি ও কারুশিল্প কর্মে ব্যাপৃত থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে। অধিক অর্থ লোভের আশায় ইউরোপের মানুষ কারুশিল্পকেই একমাত্র জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করে। এর ফলে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যেই ইউরোপে কুটির শিল্প ও কৃষি স্বতন্ত্র পথে বিকাশ লাভ করতে থাকে।

ঘটনাপঞ্জী

১. ক্রুসেডের সূচনা ও শেষ—একাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত।

২. প্রথম ক্রুসেড—১০৯৫ খৃষ্টাব্দ।

৩. তৃতীয় ক্রুসেড—১১৮৯ থেকে ১১৯২ খৃষ্টাব্দ।

৪. চতুর্থ ক্রুসেড দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে ১২০৪ খৃষ্টাব্দ।

৫. তুর্কী সুলতান সালাদিন কর্তৃক জেরুজালেম অধিকার—১১৮৭ খৃষ্টাব্দ।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন — **এক নম্বর**

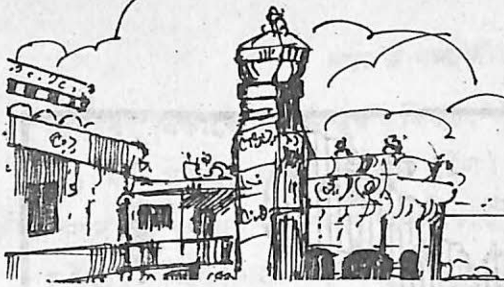
১. যীশুখৃষ্টের পবিত্র সমাধিভূমি কোথায় ?
২. কে প্রথম ধর্মযুদ্ধের আহ্বান জানান ?
৩. কত খৃষ্টাব্দে প্রথম ক্রুসেড শুরু হয় ?
৪. দ্বিতীয় আরবান কে ছিলেন ?
৫. তৃতীয় ইনোসেন্ট কে ছিলেন ?

নির্দেশক প্রশ্ন * * * * **তিন নম্বর**

১. প্রথম ক্রুসেডের সিদ্ধান্ত কখন নেওয়া হয় ? কে প্রথম ক্রুসেডের কথা ঘোষণা করেন ? [২+১]
২. তৃতীয় ক্রুসেডের প্রয়োজন হয়েছিল কেন ? তৃতীয় ক্রুসেডের উদ্যোক্তা কারা ছিলেন ? [১+২]
৩. কবে, কার উদ্যোগে চতুর্থ ক্রুসেড সংঘটিত হয় ? [১+২]
৪. তৃতীয় ক্রুসেডে জার্মান সৈন্যারা যোগ না দিয়ে দেশে ফিরে গিয়েছিল কেন ? [৩]
৫. ক্রুসেডার কাদের বলা হয় ?

রচনাত্মক প্রশ্ন * * * * * * * **৯নম্বর**

১. ক্রুসেড কাকে বলে ? প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ ক্রুসেডের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। [২+৭]
২. দ্বিতীয় আরবান কে ছিলেন ? তিনি ক্রুসেড ঘোষণা করেছিলেন কেন ? প্রথম ক্রুসেডের ফলাফল কি হয়েছিল ? [২+৩+৪]
৩. কি পরিস্থিতির জন্য তৃতীয় ক্রুসেড পাঠানো হয়েছিল ? তৃতীয় ক্রুসেড অভিযান কি সফল হয়েছিল ? এই অভিযানের বিস্তারিত বিবরণ দাও। [২+১+৬]
৪. চতুর্থ ক্রুসেড অভিযানের বিস্তারিত বিবরণ দাও। এই অভিযানের ফলাফল তোমার নিজের ভাষায় প্রকাশ কর। [৪+৫]
৫. ইউরোপের সমাজ ও সংস্কৃতির উপর ক্রুসেডের প্রভাব বর্ণনা কর। [৯]
৬. ক্রুসেডের পিছনে কি কি উদ্দেশ্য বিদ্যমান ছিল ? [৯]



নবম অধ্যায়

নগর ও নগর-জীবন

নগরের উৎপত্তি : সভ্যতার প্রথম যুগে পৃথিবীর সব জায়গায় মানুষ গ্রামে বাস করত। পরবর্তিকালে সমাজ-ব্যবস্থার বিবর্তনের ফলে রাষ্ট্র ও রাজপদের সৃষ্টি হয়। রাজা ও রাজপুরুষদের বাসস্থানকে ঘিরে নগর গড়ে উঠে। উদাহরণ হিসেবে প্রাচীন গ্রীস ও রোমের নগরগুলির নাম করা যায়। রোমানরা তাদের নগরকে বলত **মিউনিসিপিয়া**। বর্বর জার্মান জাতিগুলির আক্রমণে অধিকাংশ রোমান নগর ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। দশম ও একাদশ শতকে ইউরোপে যে নগর-রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছিল, তাদের মধ্যে **স্যাম্পেন, কোলন, মার্সেই, লিপজিগ, কেম্ব্রিজ, অক্সফোর্ড, ফ্রাঙ্কফোর্ট, ভ্যালেন্সিয়া** ইত্যাদি ছিল উল্লেখযোগ্য।

বর্তমানকালের ইতিহাসবিদ্‌রা মনে করেন যে, বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক কারণেই নগরের উৎপত্তি হয়েছিল। গ্রামে উৎপন্ন কৃষিজাত দ্রব্য কেনাবেচার জন্য খোলা জায়গায় হাট বসত। পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন গ্রামের মানুষ এই হাটে আসত প্রয়োজনীয় জিনিস কেনাবেচার উদ্দেশ্যে। কালক্রমে এই হাট গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য-কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং এই বাণিজ্য-কেন্দ্রই নগরের রূপ ধারণ করে। যেসব বন্দরের মাধ্যমে রোম সাম্রাজ্যের সঙ্গে প্রাচ্য দেশগুলির বাণিজ্য চলত, সেগুলিও নগরে রূপান্তরিত হয়েছিল। আরব জাতি ভূমধ্যসাগরে আধিপত্য বিস্তার করলে, সপ্তম শতাব্দীর পর এগুলি মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে।

সামন্ত-প্রথা প্রবর্তনের ফলে ইউরোপের সমাজ ও অর্থনীতি নতুন ভাবে গড়ে উঠে। এর ফলে এক নতুন ধরনের নগরের সৃষ্টি হয়। সামন্তগণ গ্রামাঞ্চলে কৃষিক্ষেত্রকে ঘিরে ম্যানর প্রথার মাধ্যমে এক ধরনের উৎপাদন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। চাষী ও বিভিন্ন বৃত্তির লোকেরা সামন্তপ্রভুর আনুগত্য মেনে নিয়ে ম্যানরে নিরাপদ আশ্রয় নিত এবং নিশ্চিন্তে জীবিকা নির্বাহ করত। সামন্তগণ বার্গ বা কাঠের তৈরী দুর্গ তৈরি করত। সেখানে বহুলোক নিরাপদ আশ্রয় নিত। এই ম্যানর বা দুর্গই পরে নগরে পরিণত হয়।



মধ্যযুগের শহর
মস্কো
রিগা
লণ্ডন
হামবুর্গ
লুইবেক
ড্যানজিগ
আন্টিয়োপ
কলোন
বাজেস
ফ্রাঙ্কফুর্ট
লাইপজিগ
বেসলাউ
প্যারিস
কিয়েভ
আ-ট-লা-ন্টি-ক
ম-হা-সা-গ-র
ভিয়েনা
বুডাপেস্ট
লিয়ঁ
মিলান
ভেনিস
বর্দো
জেনোয়া
মার্সাই
বেলগ্রেড
কৃ ষ্ণ সা গ র
লিসবন
টলেডো
সারাগোসা
বার্সিলোনা
পীসা
ভ্যালেন্সিয়া
কর্ডোভা
কনস্টান্টিনোপল
রোম
কাডিজ
নেপল্‌স
মালাগা
ভূ ম ধ্য সা গ র
বাগদাদ
আ ফ্রি কা

শহরের বিকাশে ক্রুসেডের ভূমিকা : ইউরোপের নগরগুলির বিকাশে ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের যথেষ্ট অবদান ছিল। একাদশ শতাব্দীতে ক্রুসেড অভিযান শুরু হওয়ার পর, বাণিজ্যিক কারণে ইউরোপের শহরগুলি সমৃদ্ধ হয়ে উঠে। বিশেষ করে চতুর্থ ক্রুসেড অভিযানের ফলে কনস্টান্টিনোপল শহরের পতন ঘটায়, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের বাণিজ্য-কেন্দ্রগুলির উপর ইউরোপীয় বণিকদের আধিপত্য স্থাপিত হয়। এরপর ঐ পথে বাণিজ্য উপলক্ষ্যে প্রাচ্য দেশে নতুন করে যাতায়াত শুরু হয়। ইউরোপের, বিশেষতঃ ইতালীর বন্দর-নগরগুলি সমৃদ্ধ হয়ে উঠে। 'নতুন নতুন দেশের চাহিদা মেটানোর জন্য শিল্পোৎপাদন বাড়তে থাকে। ক্রুসেডের সময় বহু ভূমিদাসও মুক্ত মানুষরূপে শহরে আসে এবং স্বাধীন ভাবে শিল্প কাজে অংশ গ্রহণ করে। পুরানো নগরগুলির কর্মতৎপরতা বাড়িয়ে যেমন উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়, তেমনি নতুন নতুন শিল্প-নগর গড়ে তোলা হয়। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শহরের বিকাশ এবং শ্রীবৃদ্ধি সাধনে ক্রুসেডের ভূমিকা তাই গুরুত্বপূর্ণ।

গিল্ড বা বণিক সভা : মধ্যযুগে ইউরোপীয় নগরগুলির অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ পরিচালনা করত গিল্ড (Guild) নামে একটি সংস্থা। প্রতিটি শহরের একই ধরনের কাজে নিযুক্ত কারুশিল্পীরা পারস্পরিক সুবিধা ও আত্মরক্ষার জন্য প্রত্যেকে সংঘবদ্ধ হয়ে একটি মাত্র সমিতি গঠন করে। একই পেশা ও কাজের সঙ্গে যুক্ত কারুশিল্পীদের নিয়ে গঠিত বিভিন্ন-সমিতিগুলিকেই এক একটি গিল্ড নামে অভিহিত করা হয়। যেমন তাঁত-শিল্পীদের গিল্ড, চর্ম-শিল্পীদের গিল্ড, দারু-শিল্পীদের গিল্ড ইত্যাদি। অনেকে গিল্ডকে আধুনিক চেম্বার অব কমার্স-এর সমতুল্য মনে করেন। কারুশিল্পীদের গিল্ডগুলি একটি নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হতো। এরা সমবেতভাবে যে সনদ গ্রহণ করেছিল, তার বিধি-বিধান গিল্ডের সকল সদস্য মেনে চলতে বাধ্য ছিল। গিল্ডের প্রধানরূপে কারুশিল্পীরা একজন অগ্রজ কারিগরকেই নির্বাচিত করতেন। তাঁর কাজ ছিল গিল্ডের প্রত্যেক সদস্য যথারীতি নিয়ম-কানুন মেনে চলে কিনা তা লক্ষ্য করা। নিয়মভঙ্গকারীদের প্রতি কঠোর ব্যবস্থা

গ্রহণের বিধান ছিল। কারুশিল্পীরা যাতে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত না হয় তার জন্যও গিল্ড সতর্ক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। প্রতি গিল্ড তার নিজস্ব বাজারের উপর একাধিপত্য বজায় রাখতে সচেষ্ট ছিল। এক শহর বা গ্রাম থেকে কারুশিল্পীরা যাতে অন্য শহরে এসে পণ্য বিক্রয় না করতে পারে তার প্রতিও ছিল গিল্ডের সজাগ দৃষ্টি।

প্রত্যেক সদস্য যাতে ব্যবসার সমান সুবিধা ও সুযোগ পায় গিল্ড সেদিকেও লক্ষ্য রাখত। প্রত্যেক ব্যবসায়ী একই দামে জিনিস বিক্রী করত এবং তার কর্মচারীদের নির্ধারিত সময় পর্যন্ত কাজ করাত। শ্রমিক কারিগরদের বেতন বণিকসভাই নির্দিষ্ট করে দিত।

গিল্ড শুধুমাত্র ব্যবসায়ীদের সুবিধা দেখত না। ক্রেতাদেরও স্বার্থরক্ষার দিকে লক্ষ্য রাখত। ক্রেতা যে জিনিস কিনত তা যাতে সঠিক মানের হয়, ব্যবসায়ীদের সেজন্য সতর্ক থাকতে হতো। শিল্প সভাগুলি কারিগরদের দক্ষতা বাড়াবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করত। বণিকসভার সদস্য না হয়ে কোন ব্যবসায়ী নগরে পণ্য বিক্রী করতে গেলে তার কাছ থেকে শুল্ক আদায় করা হতো।

নগরের জীবনযাত্রা : মধ্যযুগের ইউরোপীয় নগরগুলির গঠন ও জীবনযাত্রা আধুনিক কালের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। প্রতিটি নগর প্রাচীর ও পরিখা দিয়ে ঘেরা থাকত। নগর থেকে বাইরে যাওয়া আসার জন্য টানা পুল ছিল। কিছু দূর দূর অন্তর তৈরি মিনারের উপর থেকে শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করা হতো। রাস্তাগুলি প্রায় সবই ছিল সরু ও কাঁচা। অনেক পরে পাকা রাস্তার প্রচলন হয়। বর্ষার জল নিকাশের কোন ব্যবস্থা ছিল না। ফলে বেশী বৃষ্টি হলে রাস্তাগুলি অব্যবহার্য হয়ে উঠত। গরু বা ঘোড়ার গাড়ির সাহায্যে মাল পরিবহণ করা হতো। গ্রামের লোকেরা উঁচু করে বাড়ি তৈরি করত। বাড়িগুলি যাতে গির্জার চুড়া থেকে উঁচু না হয় তার প্রতি লক্ষ্য রাখা হতো। নদীর তীরবর্তী অঞ্চলের অধিবাসীরা নদী ও কূয়োর জল ব্যবহার করত। শহরের বাজার এলাকাটি ছিল খোলামেলা ও প্রশস্ত। শহরের প্রধান চার্চকে বলা হতো **ক্যাথিড্রাল**।

এটিই ছিল শহরে সবচেয়ে মনোরম ও সুউচ্চ ভবন। টাউন হল নামক ভবনে পৌরসভার কাজকর্ম পরিচালিত হতো। এর সুউচ্চ গম্বুজে বসানো থাকত একটি বড় ঘড়ি। বাজারের দিকে মুখ করে ঘড়ি বসানো ছিল মধ্যযুগের একটি রীতি। শহরের ঘরবাড়িগুলির অধিকাংশই ছিল কাঠের তৈরী। ধনী ব্যক্তিদের বাসগৃহ তৈরী হতো পাথর দিয়ে। ধনী দরিদ্রের পার্থক্য ধরা পড়ত পোশাক পরিচ্ছদে। দরিদ্ররা অতি সাধারণ পোশাকে লজ্জা নিবারণ করত।

মধ্যযুগের শহরে দরিদ্রের সংখ্যাই ছিল বেশী। যত রকমের শ্রমসাধ্য কাজ দরিদ্রকেই করতে হতো। কাজ থাকলে তাদের আহার জুটত, কাজ না থাকলে অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাতে হতো। শহরে পঙ্গু ও অক্ষম লোকের সংখ্যাও কম ছিল না। সেকালে প্রচুর দস্যুভয় ছিল, তাই সন্ধ্যার পরই রাস্তাঘাট সব জনমানব শূন্য হয়ে পড়ত।

শহরে স্বায়ত্ত শাসন : মধ্যযুগের সব জায়গাতেই সামন্ত-প্রভুদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। সুতরাং নগরগুলি যে সামন্তের অধিকৃত অঞ্চলে গড়ে উঠত, তারাই হতেন আইনতঃ সেই সব শহরের কর্তা। প্রথম দিকে প্রতিটি শহরের মানুষ সামন্ত-প্রভুর জোর-জুলুম নীরবে সহ্য করত। সামন্ত-প্রভুরা শহরবাসীদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করতেন। জরিমানা ও নানা প্রকার করও তারা শহরবাসীদের কাছ থেকে পেতেন। কোন কোন সময় সামন্ত-প্রভুরা সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে শহরবাসীদের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করতেন। সামন্ত-প্রভুদের এই ধরনের অত্যাচারে শহরের শিল্প-বাণিজ্যের অগ্রগতি ব্যাহত হতে থাকে। মধ্যযুগে চার্চ বা মঠের এলাকাভুক্ত স্থানে কোন শহর গড়ে উঠলে, বিশপরাও এই ধরনের জোর-জুলুম চালাতেন শহরবাসীদের উপর। এইভাবে নিপীড়িত ও অত্যাচারিত শহরবাসীরা সামন্ত-প্রভু ও বিশপদের হাত থেকে মুক্তিলাভের জন্য সচেষ্ট হয়। অবশেষে এদের অত্যাচরের বিরুদ্ধে সম্মিলিত ভাবে রুখে দাঁড়াবার শপথ গ্রহণ করে শহরবাসীরা। এইভাবে শুরু হয় শহরে শহরে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। যে সব দেশে কেন্দ্রীয় রাজশক্তি যত দুর্বল ছিল, সেখানকার নগর-

গুলি'তত তাড়াতাড়ি এই অধিকার আদায় করতে সক্ষম হয়েছিল। পবিত্র রোম সম্রাট ও পোপের মধ্যে বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করার সুযোগে ইতালি ও জার্মানির নগরগুলি স্বায়ত্ত শাসন লাভ করে।

রাজকীয় সনদ : শহরের মানুষদের সংঘবদ্ধ বিক্ষোভকে উপেক্ষা করা সামন্ত-প্রভুদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব ছিল। নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তাদের যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন ছিল। এই প্রয়োজনের তাগিদেই সামন্ত-প্রভুরা অর্থের বিনিময়ে শহরের বণিকদের দাবি মানতে আরম্ভ করেন। নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নিয়ে সামন্ত-প্রভুরা ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিকার ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার **সনদ** শহরবাসীদের হাতে তুলে দিতে থাকেন। ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে **জাতীয় রাষ্ট্র (National state)** গঠিত হওয়ায় সেখানকার রাজারাই উদ্যোগী হয়ে, ঐ সকল রাষ্ট্রে পৌর স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্তন করেন। শহরের নতুন শ্রেণীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলাই ছিল মধ্যযুগের রাজাদের কাম্য।

সংক্ষেপে বলা যায়, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সমগ্র পশ্চিম ইউরোপ জুড়ে স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য শহরবাসীদের নানা পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধরনের সংগ্রাম পরিচালনা করতে হয়। এইভাবেই শেষ পর্যন্ত শহরবাসীরা তাদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সাফল্য অর্জন করে।

বুর্জোয়া শব্দের উৎপত্তি : বুর্জোয়া কথাটি এসেছে ল্যাটিন বার্জ (Burg) বা বুর্জ (Bourg) শব্দ থেকে। এর অর্থ 'দুর্গ' বা কোন সুরক্ষিত অঞ্চল। শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দলে দলে লোক এসে কোন সামন্ত-দুর্গের কাছে অথবা প্রাচীর ঘেরা সুরক্ষিত জায়গায় বসতি গড়ে তুলতো। তাই এদের বলা হতো 'বার্জেস' বা বুর্জোয়া। এই অর্থে বুর্জোয়া বলতে মধ্যযুগের নগরবাসীদের বুঝাতো। নগরের অধিবাসীদের মধ্যে ব্যবসায়ী, পুরোহিত, শিক্ষক, শিল্পী, কারিগর ইত্যাদি মধ্যবিত্ত লোকেরাই ছিল বেশী। এই কারণে পরবর্তিকালে 'বুর্জোয়া' শব্দের দ্বারা 'মধ্যবিত্ত শ্রেণী'-কে বুঝানো হয়ে থাকে।

কালপঞ্জী

মধ্যযুগে শহরের বিকাশ— দশম শতাব্দী থেকে একাদশ শতাব্দী।

অনুশীলনী

মৌখিক প্রশ্ন * * * **এক নম্বর**

১. মিউনিসিপিয়া কাকে বলত ? ২. মধ্যযুগে শহরগুলি প্রথম কোথায় গড়ে উঠে ছিল ? ৩. গিল্ড কাকে বলে ? ৪. শহরের প্রধান চার্চকে কি বলা হতো ? ৫. বার্জ কথার অর্থ কি ? ৬. বুর্জোয়া কথাটি কোন্ ভাষা থেকে নেওয়া হয়েছে ?

নির্দেশক প্রশ্ন * * * * **তিন নম্বর**

১. প্রথম যুগে মানুষ কোথায় বাস করত ? কিভাবে নগর গড়ে উঠেছিল ? [১+২]
২. মধ্যযুগে নগর সম্পর্কে আধুনিক ইতিহাসবিদ্রা কি মত পোষণ করেন ? [৩]
৩. সামন্তযুগে কিভাবে শহরের বিকাশ হয়েছিল ? [৩]
৪. গিল্ড কাকে বলে ? গিল্ড কেন গঠন করা হয়েছিল ? [১+২]
৫. শহরের মানুষ রাজকীয় সনদ বলে কিভাবে স্বায়ত্ত শাসন লাভ করেছিল ? [৩]
৬. বুর্জোয়া কথাটির প্রকৃত অর্থ কি ? [৩]

রচনাত্মক প্রশ্ন * * * * * * * **৯নম্বর**

১. মধ্যযুগের ইউরোপে কিভাবে নগরের উৎপত্তি হয়েছিল ? [৯]
২. শহরের বিকাশে ক্রুসেডের ভূমিকা সংক্ষেপে আলোচনা কর। [৯]
৩. গিল্ড কাকে বলে ? নগর জীবনে গিল্ডের ভূমিকা কি ছিল ? [২+৭]
৪. মধ্যযুগে নগরের জীবনযাত্রা সংক্ষেপে বর্ণনা কর। [৯]
৫. শহরে স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠায় মানুষ কিভাবে সংগ্রাম করেছিল ? [৯]



দশম অধ্যায়

দূর প্রাচ্যের ইতিহাস ঃ চীন ও জাপান

মধ্যযুগে চীন (৭০০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৪০০ খৃষ্টাব্দ) ঃ চৈনিক সভ্যতার সূচনা অতি প্রাচীনকালে, খৃষ্টজন্মের বহু পূর্বে। এই সভ্যতা গড়ে উঠেছিল দাস মালিকানা-ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার উপর। এরই এক চরম রূপ দেখা যায় চীনে **হান** সাম্রাজ্যের শাসনকালে। হান যুগে চীন দেশে মহান সভ্যতা গড়ে উঠে। এর প্রশাসন ব্যবস্থা ছিল খুবই উন্নত। অত্যন্ত যোগ্যতার ভিত্তিতে পদস্থ রাজকর্মচারী নিয়োগ করা হতো। এই সময় চীনে ছাপাখানার ব্যবস্থা চালু হয়। চীনে এই সময় বৌদ্ধধর্ম বিশেষ ভাবে প্রচারিত হয়। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে বিখ্যাত হান বংশের পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে। ফলে চীন দেশের রাজনৈতিক ঐক্য সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়ে যায়। দেশের সর্বত্র ছোট-বড় অসংখ্য রাজ্য গড়ে ওঠে। রাজ্যগুলির মধ্যে যুদ্ধ প্রায় লেগেই থাকত। তার ফলে জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশার অন্ত ছিল না। চীনে এই অনিশ্চিত অবস্থা ও অরাজকতা চলে কয়েক শ' বছর ধরে।

সুই বংশ (৫৯০ ৬১৮ খৃষ্টাব্দ) ঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে সুই বংশের রাজারা ক্ষমতা দখল করে এই অরাজকতার অবসান ঘটায়। কিন্তু সুই রাজাদের অনাচার, বিলাসিতা ও অপব্যয় দেখে জনগণ বিরূপ হয়ে ওঠে ও তাদের বিদ্রোহের ফলে সুই রাজারা ক্ষমতাচ্যুত হন। এরপর ৬১৮ খৃষ্টাব্দে লি-উয়ান নামে বিদ্রোহীদের একজন সেনাপতি নতুন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের নাম **তাঙ বংশ**।

তাঙ বংশ ঃ (৬১৮-৯০ খৃঃ) তাঙ বংশ প্রায় তিনশ' বছর রাজত্ব করে। তাঙ রাজারা সুই ও তাদের চেয়ে অনেক দক্ষ ছিলেন। ফলে চীনে একটি শক্তিশালী শাসনব্যবস্থা গড়ে ওঠে। অনেকের মতে চীনের ইতিহাসে এই সময়কে স্বর্ণযুগ বলা হয়। তাঙ সম্রাটদের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব দেশকে ঐক্যবদ্ধ করে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা। তাঙ সম্রাট **কাও-সু** ছিলেন দিগ্বিজয়ী বীর ও সুশাসক। তাঁর সময় **আনাম** ও

কম্বোজ রাজ্য চীন সাম্রাজ্যের অধীনে আসে। পশ্চিমে কাও সু-র সাম্রাজ্য পারস্য ও কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। পরে কোরিয়ার দুটি রাজ্য তাঙ সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়।

তাঙ সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল **সি-আন-ফু** শহর। সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসাবে এই শহরের খ্যাতি সারা দূর প্রাচ্যে বিস্তৃত ছিল। পারে **চাঙ আন** শহরে এই রাজধানী সরিয়ে নেওয়া হয়। স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে চাঙ আন সেকালের শ্রেষ্ঠ শহরগুলির অন্যতম ছিল। সুশাসনের জন্য তাঙ রাজারা সমগ্র চীনকে কয়েকটি প্রদেশে ভাগ করেন। শিক্ষার গুরুত্ব এই সময়ে সরকারী ভাবে গৃহীত হয়। শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে দেশে অনেক বিদ্যালয় ও উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। দেশে প্রচলিত আইনগুলি চালু করার জন্য নতুন করে লেখা হয়। চীনে সেচ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করবার জন্য অনেক খাল কাটা হয়। ফলে দেশের কৃষির উন্নতি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের বিরাট প্রসার ঘটে। পানীয় হিসাবে চায়ের আবিষ্কার ও ব্যবহার তাঙ যুগে যুগান্তকারী ঘটনা। ৯০৭ খৃষ্টাব্দে **চু ওয়েন** নামে একজন সেনাপতি তাঙ রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে নতুন বংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

তাঙ শাসনের নানাদিক

আইন : চীনদেশের আইনবিধি সুপ্রাচীনকাল থেকে কনফুসিয়াসের শিক্ষার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল। বারে বারে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরিত হলেও চীন জাতির রক্ষণশীল মনোভাবের জন্য ঐ সকল আইনের বিশেষ কোন পরিবর্তন হতো না। তাঙ সম্রাটদের আমলে হান পরবর্তী যুগের বিশৃঙ্খলার ফলে আইনের যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা গিয়েছিল, সেগুলি তাঁরা সংশোধন করেন।

শিক্ষা ও বিদ্যাচর্চা : তাঙ সম্রাটের শাসনকালে চীনদেশে অনেকগুলি সরকারী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। সরকারী কাজের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা ওই সব বিদ্যালয়ে দেওয়া হতো। ইতিহাস, গণিত, ভূগোল এবং কবিতা ছিল

পাঠ্যবস্তু। এছাড়া কনফুসিয়াসের উপদেশগুলিও ছাত্রদের শিখতে হতো। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে সরকারী পদের নিয়োগের ব্যবস্থা তাঙ সম্রাটগণ চালু করেন। সকল পরীক্ষার্থীদের উপাধি হতো **চিন শি**। প্রতি তিন বছরে একবার এই পরীক্ষা হতো। কাগজ প্রস্তুত প্রণালী চীনারা এই সময়ে উদ্ভাবন করে।

বিদ্যালয় ছাড়াও মঠগুলিতে বিদ্যাচর্চা হতো। তবে সেখানে বিশেষ ভাবে ধর্ম শিক্ষাই দেওয়া হতো।

কাব্য ও সাহিত্য : তিনশ' বছরের তাঙ রাজত্বে চীনদেশে কাব্য ও সাহিত্যে অসাধারণ বিকাশ সাধিত হয়েছিল। সর্বকালের চীনা সাহিত্যের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ কবি তাঙ যুগে জন্মগ্রহণ করেন। এঁরা হলেন **পো চু ই, লি-পো, তু-ফু, ওয়ান-ওয়াই** এবং **ওয়েই ইং-য়ু**। এই যুগের একটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হলো তাঙ চু'য়ান-চি। মানুষের জীবন ও সুখ-দুঃখের কাহিনী নিয়ে রচিত এই গ্রন্থখানি বিশ্ব সাহিত্যের ইতিহাসে আদি রচনার অন্যতম নিদর্শন রূপে স্বীকার করা হয়। বিখ্যাত কবি তু-ফু ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে অর্থ নৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যকে তার লেখায় ফুটিয়ে তুলেছিলেন। চীনা সাহিত্যে তিনি 'ঋষি-কবি' নামে পরিচিত। চীনা পণ্ডিতরা এই সময়ে দুটি বিশ্বকোষ সংকলন করেন।

মুদ্রণ শিল্প : তাঙ সম্রাটদের শাসকালে চীনদেশে মুদ্রণ শিল্পের বিকাশ ঘটে। খুব সম্ভব জাপান থেকে সর্বপ্রথম কাঠের তৈরী ব্লকের সাহায্যে চীনারা ছাপার কাজ শুরু করে। ৮৬৮ খৃষ্টাব্দে একখানা বৌদ্ধ সূত্রগ্রন্থ ছাপিয়ে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। তাঙ সম্রাটদের উৎসাহে ও আনুকূল্যে এই শিল্পে যথেষ্ট উন্নতি হয়। ফলে শিক্ষাচর্চার ব্যাপক প্রসার ঘটে।

চারুকলা : তাঙ রাজত্বে চারুকলার বিকাশ এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্যে চীনা শিল্পীরা বিশেষভাবে পারদর্শী ছিলেন। **কান-সু** প্রদেশে একটি পাহাড় কেটে সাতশ' গুহা তৈরি করা হয়। গুহার গায়ে চীনা শিল্পীরা তাঁদের নিজস্ব রীতিতে বুদ্ধের জীবন, ছবি ও মূর্তির মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। **উ-তাও-সুয়ান** ছিলেন তাঙ যুগের শ্রেষ্ঠ চিত্রকর।

ব্যবসা-বাণিজ্য ঃ চীনা ব্যবসায়ীরা তাঙ যুগে দেশের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ঘুরে বেড়াত। তখন জলপথে পণ্যসম্ভার আনা-নেওয়া করা হতো। তাঙ যুগে বাইরের দেশগুলির সঙ্গেও চীনদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। সমুদ্রপথে চীনা জাহাজ নানা পণ্য নিয়ে তখন ভিয়েৎনাম, যবদ্বীপ, মালাক্কা, বলিদ্বীপ ও ভারতের নানা বন্দরে আসত। অপরপক্ষে বহুদেশের বণিকরাও তাঁদের দেশের পণ্য-সামগ্রী নিয়ে চীনদেশে যেত। চীনের সমুদ্র-তীরবর্তী নানা শহরে বিদেশীদের ভীড় লেগেই থাকত। স্থলপথেও চীন থেকে উঠের পিঠে মালপত্র চাপিয়ে বাণিজ্যযাত্রা হতো মধ্য এশিয়া, ইরান ও বাইজান্টিয়ামের নানা স্থানে। ইতিহাসে এই স্থল-বাণিজ্যের পথ **রেশম পথ** বা **সিল্ক রুট** নামে বিখ্যাত। আরবগণ ও মধ্য এশিয়ার যাযাবর জাতিগুলি গোবি মরুভূমির ভিতর দিয়ে পণ্যবাহী ঘোড়া ও উট নিয়ে চীনদেশে আসত। ফিরবার সময় তারা রেশমী কাপড়, ব্রোঞ্জের আয়না ও চীনামাটির সৌখিন জিনিস নিয়ে যেত। **'পোর্সিলিনের'** ব্যবহার পৃথিবীতে প্রথম শুরু হয় চীনে। সাধারণ ভাবে এই পোর্সিলিনকে চীনামাটি বলা হয়। তাঙ যুগের আর একটি বিশিষ্ট উৎপাদন সামগ্রী হলো কাগজ। **ইয়াং-চাও, চেং-তু** ও **ক্যাণ্টন** ছিল সে যুগের প্রধান সমুদ্র বন্দর।

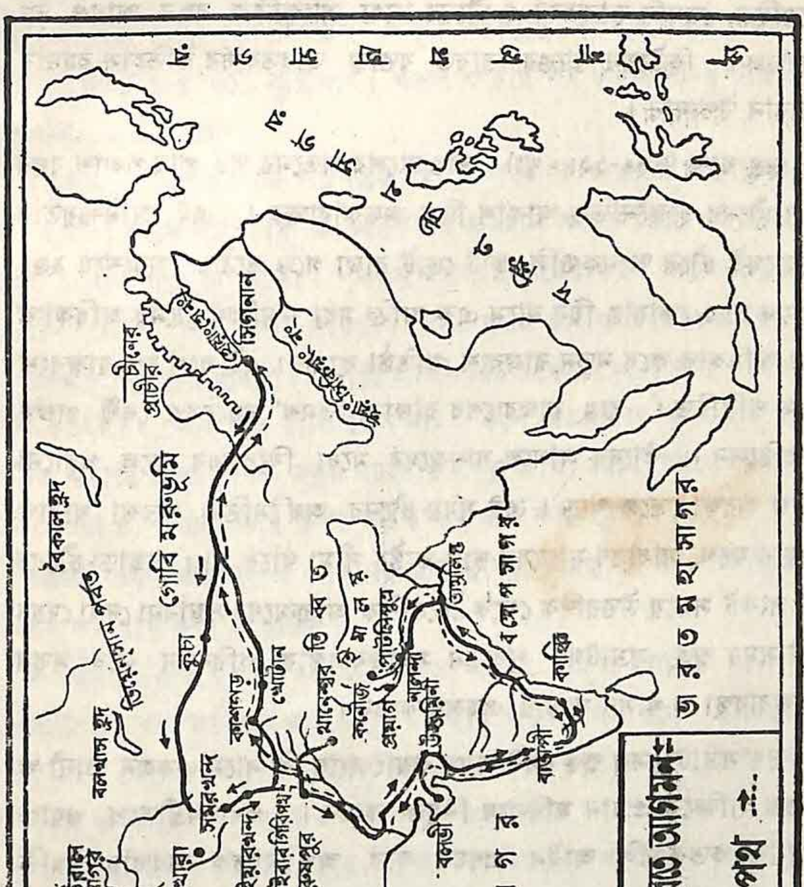
তাঙ যুগের কৃষি ব্যবস্থা ঃ বিশাল দেশের খাদ্য উৎপাদনের জন্য কৃষি-কার্যের উপর তাঙ সম্রাটরা **গুরুত্ব** দিয়েছিলেন। অদি প্রাচীনকালে চীনদেশে কৃষিকার্যে সেচব্যবস্থার সূচনা হয়। বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বাঁধ তৈরি করা হতো। তাঙ রাজারা সেচ ব্যবস্থার আরও উন্নতি করে ধান চাষের ব্যাপক বিস্তার ঘটাতে সচেষ্ট হন। দক্ষিণ চীনের চাষীরা বছরে দু'বার ধান চাষ করতো। ইক্ষু ও চায়ের উৎপাদন বাড়াবার ব্যবস্থা করা হয়।

চীনে বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঃ খৃষ্টীয় প্রথম শতকের **হান** সম্রাট **মিঙতির** রাজত্বকালেই চীনে **বৌদ্ধধর্মের** প্রচার প্রথম শুরু হয়। একাজে ব্রতী হয়েছিলেন **ধর্মরত্ন ও কাশ্যপমাতঙ্গ** নামে দুই ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত ও

প্রচারক। তবে চীনে বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রচার ঘটে চতুর্থ শতকে মহাপণ্ডিত **কুমারজী, পরমার্থ** প্রমুখ প্রচারকের উদ্যোগে। এই সময়ে চীন-ভারত বাণিজ্যিক-সংযোগ ছাড়াও ধর্মীয় যোগাযোগও ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। তখন থেকেই গৌতম বুদ্ধের দেশ ও তাঁর সাধনার স্থানগুলি দেখার আগ্রহ নিয়ে বহু চীনা বৌদ্ধ ভারতে আসতে থাকেন। চীন সম্রাটদের আনুকূল্যে অনেক চীনা পণ্ডিত বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন চর্চার জন্যে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার্থী হিসাবে আসেন। বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক **ফা-হিয়েন** চতুর্থ শতকেই ভারত থেকে বহু সংস্কৃত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে চীনে ফিরে যান। তিনি বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ **বিনয়পিটক** চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন। এই সময় থেকেই বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র হিসাবে **নালন্দা** বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি এশিয়ার সমস্ত সভ্য অঞ্চলগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। অধিকাংশ চৈনিক শ্রমণ ভারতে এসে নালন্দায় বিদ্যাশিক্ষা করতেন।

হিউয়েন সাঙ-এর ভারত ভ্রমণ : অতি প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষ ও চীনের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল। চীনে বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তিত হবার পর বহু নিষ্ঠাবান চীনা তীর্থযাত্রী দুর্গম পথ অতিক্রম করে বুদ্ধদেবের জন্মস্থান দেখতে আসতেন। **হিউয়েন সাঙ** ছিলেন এরূপ একজন তীর্থযাত্রী। ৬০৪ খৃষ্টাব্দে **হোনান** প্রদেশে তাঁর জন্ম হয়। হিউয়েন সাঙ ছিলেন মেধাবী ছাত্র। তিনি বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে তাঁর মনে অনেক প্রশ্নের উদ্ভব হয়। ভারতবর্ষে গিয়ে মূল গ্রন্থ পাঠ করে এবং সেখানকার পণ্ডিতদের সঙ্গে আলোচনা করে তিনি তাঁর সন্দেহ দূর করতে মনস্থ করলেন। অতঃপর হিউয়েন সাঙ ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে ৬২৯ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে উপস্থিত হন। উত্তর ভারত তখন হর্ষবর্ধনের অধীন। একে একে শ্রাবস্তী, কপিলাবস্তু, কাশী, বুদ্ধগয়া প্রভৃতি বৌদ্ধ তীর্থক্ষেত্র ঘুরে তিনি পূর্ব উপকূল ধরে দক্ষিণ ভারতে উপস্থিত হন। পল্লব, চালুক্য প্রভৃতি হিন্দুরাজ্যগুলি দর্শন করার পর সৌরাষ্ট্র ও সিন্ধুদেশ হয়ে একই পথে আবার দেশে ফিরে যান। মোট চৌদ্দ বছর তিনি ভারতে ছিলেন। নালন্দার মহাপণ্ডিত শীলভদ্রের কাছে তিনি কয়েক বছর বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। চীনে ফিরে গিয়ে তিনি

ভারতবর্ষ সম্পর্কে একখানি ভ্রমণকাহিনী রচনা করেন। তিনি ভারতবর্ষ



থেকে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে প্রায় ছয় শ' বই সংগ্রহ করেছিলেন। ঐ বইগুলি সবই তিনি চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন। হিউয়েন সাঙ-এর ভারত ভ্রমণের তাৎপর্য

অসাধারণ। এর ফলে চীনে যেমন বৌদ্ধধর্মের প্রসার ও জনপ্রিয়তা বেড়ে গিয়েছিল, তেমনি ভারতবর্ষ ও চীনের মধ্যে সাংস্কৃতিক বন্ধন আরও দৃঢ় হয়েছিল। হিউয়েন সাঙের ভারত বৃত্তান্ত ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনার মূল্যবান উপাদান।

সুঙ বংশ (৯৬০-১২৮০ খৃঃ) : তাঙ্ বংশের পতনের পর প্রায় পঞ্চাশ বছর কাল চীনের রাজনৈতিক আকাশ ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন। এই অনিশ্চয়তার সুযোগেই চীনে অনেকগুলি ছোট ছোট রাজ্য গড়ে ওঠে। অবশেষে ৯৬০ খৃষ্টাব্দে চাও-কোয়াঙ-য়িন্ নামে এক ব্যক্তি মধ্য ও দক্ষিণ চীনের অধিকাংশ স্থান অধিকার করে নতুন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশ সুঙ্ রাজবংশ নামে পরিচিত। সুঙ্ রাজবংশের রাজারা তিনশ' বছরেরও বেশী রাজত্ব করেছিলেন। তাঁদের আমলে সামন্তদের মধ্যে বিরোধের ফলে পুরানো সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। এই সময় চীনের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হওয়ার ফলে, সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্টের সীমা থাকে না। তাছাড়া চীনের এই সংকট সময়ে উত্তরদিক থেকে বৈদেশিক আক্রমণের সম্ভাবনা দেখা দেয়। সেই সময় সুঙ্ সম্রাটগণ পুরাতন সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন করে নতুন সমাজব্যবস্থা ও শাসন-সংস্কার প্রচলন করেন।

সুঙ সম্রাট সেন্ সুঙ সেই সময় ওয়াং-আন্ শি নামে একজন জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তিকে প্রধান মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করেন। প্রধানমন্ত্রীরূপে ওয়াং-আন্-শি কতকগুলি আইন প্রণয়ন করে, অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন করেন। যেমন—

প্রথমতঃ, অর্থের অপচয় বন্ধ করতে একটি কমিশন গঠন করা হয়। এই কমিশনের হাতে সরকারী আয়-ব্যয়ের হিসাব তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয়।

দ্বিতীয়তঃ, হান্ ও তাঙ্ শাসনকালে স্বাধীন বাণিজ্য-নীতি প্রচলিত ছিল। সুঙ্ সম্রাটগণ বাণিজ্যনীতিকে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন করেন। প্রত্যেক জেলায় উৎপন্ন ফসল থেকে রাজস্ব ও জেলার প্রয়োজন মেটানো হতো উদ্বৃত্ত ফসল সরকার কিনে নিয়ে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করতেন।

তৃতীয়তঃ, প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী কৃষকেরা বীজ কেনার আগে মহাজনদের কাছে চড়া সুদে টাকা ধার করত। নতুন ব্যবস্থায় সরকার অল্প সুদে কৃষকদের টাকা ধার দিতে লাগলেন। ফসল কাটার পর কৃষকদের ঐ টাকা পরিশোধ করতে হতো।

চতুর্থতঃ, প্রচলিত নিয়ম অনুসারে প্রত্যেক চাষীকে রাজস্ব পরিশোধের জন্য সরকারী কাজে বাধ্যতামূলক কয়েকদিন শ্রমদান করতে হতো। এতে চাষের কাজের অসুবিধা হতো। নতুন ব্যবস্থায় শ্রমের বদলে নতুন করে কর ধার্য হলো। এই করের পরিমাণ নির্ভর করত চাষীর অবস্থার উপর।

পঞ্চমতঃ, পুরানো ব্যবস্থা অনুযায়ী জমির সঠিক হিসাব না থাকায় জমির উপর করধার্যের কোন সুষ্ঠু রীতি ছিল না। ফলে সরকারের ভূমি-রাজস্ব ঠিকমত আদায় হতো না। নতুন ব্যবস্থায় সমস্ত জমি সমান ভাগে ভাগ করে দেওয়া হলো এবং তার উপর সঠিক কর ধার্য করা হলো।

ষষ্ঠতঃ, ওয়াং আন্-শি-র আইনের বলে স্থাবর ও অস্থাবর সব সম্পত্তির উপরেই কর ধার্য করা হয়েছিল।

সপ্তমতঃ, প্রথমে সামরিক বাহিনীতে অনেক উদ্বৃত্ত সৈনিক ছিল। সেনাবাহিনীর ব্যয় কমাবার জন্য নতুন ব্যবস্থায় উদ্বৃত্ত সৈনিকদের ছাঁটাই করা হয়। কোনও পরিবারে একাধিক যুবক থাকলে, তাদের পুলিশ বা প্রতিরক্ষা বাহিনীতে পাঠানো বাধ্যতামূলক করা হলো।

এইভাবে আইন তৈরী হওয়ায় চীনের রক্ষণশীলদের স্বার্থহানি হওয়ার ফলে তারা এই আইনগুলি তুলে দেবার চেষ্টা করেছিল। তার ফলস্বরূপ নতুন ব্যবস্থায় মাঝে মাঝে বাধা আসত। এই ঘটনা থেকে জানা যায় যে, ওয়াং আন্-শি-রচিত আইনগুলির খুব বেশী সুফল পাওয়া যায় নি।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি : সুঙ্ সম্রাটদের যুগে শিক্ষা-পদ্ধতির সংস্কার করা হয় এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নতুন চিন্তাধারার অনুসরণ করা হয়। তাঙ্ আমলে যেমন কবি ও কাব্যচর্চাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল, সুঙ্ যুগে গদ্যচর্চার উপরে বেশী লক্ষ্য দেওয়া হয়। এই যুগে পণ্ডিতদের মধ্যে ইতিহাস রচনার আগ্রহ দেখা যায়। এইসব পণ্ডিত তাঙ্ ও তার পরবর্তী পাঁচটি

রাজবংশের ইতিহাস রচনা করেন। স্যু-মা-কুয়াং ছিলেন সুঙ্ যুগের শ্রেষ্ঠ ইতিহাসবিদ্। সুঙ্ বৈজ্ঞানিকগণই প্রথম বিস্ফোরক পদার্থ দিয়ে তুবড়ীর মত একপ্রকার বাজী তৈরি করেছিলেন। এই যুগেই বীজগণিতের চর্চা শুরু হয়। সম্ভবতঃ আরব বণিকদের মাধ্যমেই চীনদেশে বীজগণিত প্রচলন হয়।

চীনের নানা জায়গায় শিক্ষার কেন্দ্র গড়ে উঠে ও বৌদ্ধধর্মের আদর্শের উপর চীনের দর্শনশাস্ত্র উৎকর্ষ লাভ করে। চিত্র শিল্প, হস্তলিখন ও নকশা খোদাই শিল্পের এ যুগে চরম উন্নতি হয়। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে চীন এ যুগে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছিল।

য়ুয়ান যুগ (১২৮০-১৩৬৮ খৃঃ): ১২৮০ খৃষ্টাব্দে মোঙ্গলদের বারবার আক্রমণে সুঙ্ সাম্রাজ্যের পতন হওয়ার পর, মোঙ্গল উপজাতিদের প্রধান নেতা কুবলাই খান চীনে নতুন রাজবংশ স্থাপন করেন। এই বংশের নাম য়ুয়ান বংশ। চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত এই বংশ চীনে রাজত্ব করেছিল।

মোঙ্গলরা ছিল দুর্ধর্ষ জাতি। চীনা শব্দ 'মেং' থেকে মোঙ্গল শব্দের উৎপত্তি বলে অনেকে মনে করেন। মেং শব্দের অর্থ হলো সাহসী। মোঙ্গলরা ছিল পূর্ববর্তী সেলজুক তুর্কীদের জাতি। এদের আদি বাসভূমি ছিল মধ্য এশিয়ায়। যাযাবর মোঙ্গলদের পশুপালনই ছিল প্রধান উপজীবিকা। যুদ্ধবিদ্যাতেও এরা ছিল খুবই পটু। মধ্যযুগের শেষদিকে মোঙ্গলরা চেঙ্গিস খানের নেতৃত্বে খুবই শক্তিশালী হয়ে ওঠে; সেই সময় চীন সাম্রাজ্য তিনভাগে বিভক্ত ছিল। এর উত্তরাংশকে কিন্ (বা চিন্) রাজ্য বলা হতো. দক্ষিণ অংশে সুঙ্ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্ সম্রাট মোঙ্গলদের কাছে কর আদায় করতেন। ১২১১ খৃষ্টাব্দে চেঙ্গিস খান কিন্ সাম্রাজ্য অধিকার করেন। অতঃপর তিনি পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর থেকে পশ্চিমে রাশিয়ার নিপার ও ভলগা নদীর উপত্যকা পর্যন্ত এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। ১২২৭ খৃষ্টাব্দে চেঙ্গিস খানের মৃত্যু হয়।

কুবলাই খানঃ চেঙ্গিস-এর মৃত্যুর পর মোঙ্গলরা পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদের ফলে সাময়িক ভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। ১২৬০ খৃষ্টাব্দে চেঙ্গিস

খানের পৌত্র কুবলাই খানের সুযোগ্য নেতৃত্বে মোঙ্গলরা আবার ঐক্যবদ্ধ হয়ে সুঙ্ সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। ১২৭৬ খৃষ্টাব্দে সুঙ্ রাজ্যের রাজধানী হ্যাঙ্-চাউ-এর পতন হয়। পরবর্তী চার বছরের মধ্যে কুবলাই খান সমগ্র চীনের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন। অতঃপর তিনি টঙকিঙ্, আনাম ও ব্রহ্মদেশ দখল করে তাঁর সাম্রাজ্য প্রশান্ত মহাসাগরের তীর থেকে মধ্য ইউরোপ পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। তাঁর রাজধানী ছিল বর্তমান পিকিং শহরের কাছে ক্যাম্বালাক শহরে। কুবলাই খান বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি শিক্ষা-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তিব্বতীয় রীতিনীতির পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর চেষ্টায় বহু সংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। কুবলাই খান ধর্ম সম্বন্ধেও উদার মনোভাব পোষণ করতেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করলেও, চীনের কনফুসীয় মতবাদ ও ইসলাম ধর্মের প্রতিও সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন।


কুবলাই খান

১২৯২ খৃষ্টাব্দে কুবলাই খানের মৃত্যুর পর বিশাল মোঙ্গল সামাজ্য পাঁচটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। কুবলাই খানের দুর্বল উত্তরাধিকারীদের পক্ষে এই বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করা সম্ভব হয়নি।

মার্কো পোলোর বিবরণ : কুবলাই খানের রাজত্বকালে ইউরোপ মহাদেশ থেকে বণিকের দল চীনদেশে আসত। মার্কো পোলো ছিলেন ভেনিস দেশীয় একজন বণিক। ১২৭৪ কিংবা ১২৭৫ খৃষ্টাব্দে মার্কো পোলো তাঁর পিতা ও পিতৃব্যের সঙ্গে ভেনিস থেকে চীনের পথে যাত্রা করেন। তখন তাঁর বয়স একুশ বছর। ভেনিস থেকে পিকিং পৌঁছাতে তাঁদের সাড়ে তিন বছর সময় লেগেছিল। এই সময়ের মধ্যে মার্কো পোলো

মোঙ্গলদের ভাষা ভালোভাবে শিখে নিয়েছিলেন। চীনা ভাষাও তিনি মোটামুটি আয়ত্ত করেন।

পিকিং-এ তরুণ মার্কো কুবলাই খানের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেন। সেই থেকে একটানা ষোল বছর তিনি চীনে বসবাস করেন। কুবলাই খান মার্কো পোলোকে নানা গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পদে নিয়োগ করেছিলেন। এক সময়ে মার্কো পোলো চীনের একটি প্রদেশের শাসন কর্তৃত্ব লাভ করেছিলেন। সরকারী কাজের দায়িত্ব নিয়ে মার্কো পোলোকে চীনের বিভিন্ন অঞ্চলে যেতে হয়েছিল। দীর্ঘদিন এইভাবে কুবলাই খানের কাছে কর্মরত থেকে ১২৯২ খৃষ্টাব্দে মার্কো পোলো জলপথে দেশে ফিরে যান। দেশে ফিরে তিনি এক সুন্দর ভ্রমণ বৃত্তান্ত রচনা করেন। শোনা যায়, জেনোয়ার যুদ্ধবন্দী অবস্থায় তাঁর মুখে শুনে আর একজন বন্দী এই কাহিনী লিখে রাখেন। মার্কো পোলোর ভ্রমণ কাহিনী দুঃসাহসিক অভিযানের বিবরণ মাত্র নয়, এর মধ্য দিয়ে দুই মহাদেশে যাতায়াতের যে ভৌগোলিক পরিচয় পাওয়া যায় তার মূল্য অনেক।



মার্কো পোলো

মার্কো পোলো লিখেছেন, চীন ছিল বিরাট ও সমৃদ্ধিশালী দেশ। দেশে বড় বড় শহর ছিল এবং শহরের পৌর ব্যবস্থা খুবই উন্নত ছিল। প্রশাসনের কাজে সুবিধার জন্য একরকম ডাকব্যবস্থা পরিচালনা করা হয়েছিল। 'রিলে' প্রথায় অশ্বারোহীরা এই ডাক নিয়ে দিনে ১০০ মাইল পর্যন্ত যেতে পারত।

মার্কো পোলো আরও লিখেছেন, চীনের মানুষ জ্বালানীর জন্য এক রকম কালো পাথর ব্যবহার করত। এই জ্বালানী সংগ্রহ করা হতো মাটির নীচে থেকে। এর থেকে অনুমান করা যেতে পারে, এই কালো পাথর কয়লা ছাড়া


কুবলাই খানের সাম্রাজ্য
ভেনিস
কনস্টান্টিনোপল
কৃষ্ণ সাগর
কাস্পিয়ান সাগর
বোখারা
সমরখন্দ
খোটান
পিকিং
হ্যাংচাউ
অরিজ
কিরমান
অরমুজ
একার
নীলনদ
কালিকট
কুবলাইখানের সাম্রাজ্য
ও
মার্কোপোলোর ভ্রমণ-পথ

আর কিছুই নয়। মার্কো পোলোর বিবরণী থেকে জানা যায়, কুবলাই খান চীনে দেশে কাগজের টাকা চালু করেছিলেন। এই কাগজ রাজকোষে জমা দিলে, তার পরিবর্তে সোনা পাওয়া যেত। মার্কো পোলোর ভ্রমণবৃত্তান্ত মধ্যযুগের চীনদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার প্রামাণ্য দলিল।

মধ্যযুগে জাপান

চীনের নিকটতম প্রতিবেশী দেশগুলির মধ্যে জাপান অন্যতম। প্রশান্ত মহাসাগরের চারটি বড় এবং প্রায় তিনশ' ছোট ছোট দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে গড়ে উঠেছে জাপান। চারিটি বড় দ্বীপ হলো হনস্যু, কিউসিউ, শিকোকু ও হোক্কাইডো। জাপান সাগর এশিয়ার মূল ভূখণ্ড থেকে জাপানকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। জাপানের দ্বীপগুলির বেশির ভাগই আগ্নেয়গিরি ও পাহাড়ে ভরা। প্রাচীনকালে জাপানে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। বংশানুক্রমিক ক্ষমতা অধিকার এবং গোষ্ঠীগত ঐক্যের প্রতি জাপানীদের অনুরাগ ছিল প্রবল। প্রাচীন লোকগাথা থেকে জানতে পারা যায় যে, কিউ-স্যুর একটি গোষ্ঠী ইয়ামাতো সমভূমিতে বসতি স্থাপন করে। তারপর ক্রমে ক্রমে অন্যান্য গোষ্ঠীর উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে। অবশেষে কিউ-স্যু গোষ্ঠী জাপানের মধ্য এবং পশ্চিম অঞ্চল জুড়ে রাজ্যস্থাপন করে। এই গোষ্ঠী অন্যান্য গোষ্ঠীর উপর এমন প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, কিউ-স্যু গোষ্ঠীনেতা অন্যান্য গোষ্ঠীর পুরোহিতদের মধ্যে প্রধান বলে স্বীকৃত হয়। ইয়ামাতো পুরোহিতগণই জাপানে সর্বপ্রথম রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন।

মধ্যযুগে জাপানী সমাজ-ব্যবস্থা ও সামন্ততন্ত্র : সপ্তম শতাব্দীতে চীনের অনুকরণে জাপানের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো গঠিত হওয়ার ফলে তার নিজস্ব ভাবধারা নষ্ট হয়ে যায়। অতিরিক্ত কেন্দ্রীভূত এই ব্যবস্থা গোষ্ঠী দ্বারা পরিচালিত একটি ছোট দেশের উপযোগী ছিল না। এখানকার বিভিন্ন প্রদেশগুলির গোষ্ঠীগত পার্থক্য ও নিজ অধিকারবোধ এত বেশী ছিল যে, কেন্দ্রের কোনও কর্মচারীদের দিয়ে এই প্রদেশগুলির শাসনকাজ চালানো যেত না। প্রদেশগুলির শাসনকাজ চালাত প্রাদেশিক কর্মচারিগণ। এইসব

কর্মচারী স্থানীয় অভিজাত পরিবার থেকে নিযুক্ত করা হতো। এরা স্বাধীনভাবে শাসনকাজ চালাত, এদের উপর কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ একরকম ছিলই না বলা যায়। এদের এই স্বেচ্ছাচার, স্বাধীন মনোভাব এবং কেন্দ্রের প্রতি আনুগত্যের অভাবেই জাপানে সামন্তপ্রথা প্রচলিত হয়েছিল।

জাপানের জমিবণ্টন ব্যবস্থা এবং রাজকর্মচারী নিয়োগ প্রথা চীন থেকে স্বতন্ত্র রূপ গ্রহণ করেছিল। চীনদেশে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি-যোগিতামূলক পরীক্ষায় যারা সাফল্য লাভ করত, তাদেরই সরকারী কর্মচারীরূপে নিয়োগ করা হতো। এই সব ক্ষেত্রে দরিদ্র, মধ্যবিত্ত বা অভিজাত কোন বিচার করা হতো না। জাপানেও এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল, কিন্তু যে সব পরীক্ষার্থী সাফল্যলাভ করত, তারা সবাই উচ্চপদ পেত না। একমাত্র অভিজাত পরিবারের লোকেরাই কেন্দ্রীয় উচ্চপদ লাভ করত। ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বার্থরক্ষায় দক্ষ কর্মচারীর অভাব দেখা দিয়েছিল।

জাপানে উচ্চপদস্থ সরকারী আমলাদেরই কৃষিজমি দেওয়া হতো। এজন্য তাদের কোনও কর দিতে হতো না। অবশিষ্ট জমিগুলি প্রজাদের বিতরণ করা হতো। সরকারের প্রধান আয়ই ছিল ভূমি-রাজস্ব। সেই কারণে কৃষিজমির জন্য সাধারণ প্রজাদের উপর অনেক বেশী পরিমাণ কর ধার্য করা হতো। সাধারণ প্রজাদের ঐ কর দেওয়া ছিল অসম্ভব ব্যাপার। বাধ্য হয়ে সাধারণ প্রজারা তাদের জমি কোন অভিজাত পরিবারকে হস্তান্তর করত। এইভাবেই জাপানে জমিদার বা জায়গীরদারের সৃষ্টি হয়। এঁরা সবই ছিলেন সরকারী কর্মচারী অথবা স্থানীয় অভিজাত ব্যক্তি।

অনেক সময় সরকারী কর মেটাতে সাধারণ প্রজা উৎপন্ন ফসলের একাংশ তুলে দিত অভিজাত শ্রেণীর হাতে। তিনি উৎপন্ন ফসলের একাংশ নিয়েও তৃপ্তি পেতেন না। সরকারকে ফাঁকি দিতে আরও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীকে বশীভূত করতেন। এইভাবেই করমুক্ত জমির পরিমাণ বাড়তে থাকে এবং সরকারকে করও ফাঁকি দেওয়ার সুন্দর পরিকল্পনা করা হয়। এই ভাবে শেষে এমন অবস্থা হলো যে, জাতীয় ভূ-সম্পত্তি কিছুই রইলো না,

এবং ভূমিসংক্রান্ত আয় কমে যাওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা কমে গেল। ক্রমে সামন্তগণ বা জমিদাররাই ক্ষমতার অধিকারী হলো।

জাপানের কেন্দ্রীয় সামন্ত-প্রভুর সঙ্গে ইউরোপীয় নাইটের অদ্ভুত মিল দেখা যায়। এরা ছিলেন প্রাচীন গোষ্ঠীপতি এবং মধ্যযুগীয় অভিজাত পরিবারের অশ্বারোহী যোদ্ধা। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার ফলে তিনি করমুক্ত জমিদারীর মালিক হলেন। এই সামন্ত-প্রভুরা কেন্দ্রীয় মঠ বা রাজপরিবারের আনুগত্য স্বীকার করতেন। তবে নিজস্ব অনুগত যোদ্ধাদের প্রতি এদের বেশী ভরসা ছিল। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে অনেকগুলি জমিদারী এক হয়ে এক একটি বৃহৎ জমিদারীর উৎপত্তি হয়। এদের মালিকদের বলা হতো **দাইমিয়ো**। এরা বড় বড় পদাতিক বাহিনী নিয়ে যুদ্ধ করতেন এই দাইমিয়োদের জন্যই ছোট ছোট সামন্তদের প্রভাব কমে যায়।

সামন্ত গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্রাটের বিরোধিতা ঃ সামন্ত-প্রথার ফলে জাপানে সম্রাটের মর্যাদা নষ্ট হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকার দুর্বল হয়ে পড়ে। সামন্তগোষ্ঠীরা সম্রাটের সকল ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে তাঁকে শক্তিহীন করে তোলে। এইসব সামন্তগোষ্ঠীর মধ্যে **ফুজিয়ারা** পরিবার অন্যতম। এই পরিবার জমিদারী ও আর্থিক শক্তির বলে সম্রাটের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাছাড়া রাজ-পরিবারের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ায় ফুজিয়ারা গোষ্ঠীর বংশমর্যাদা অনেক বেড়ে যায়। কোন নাবালক সম্রাট পদে অভিষিক্ত হলে, ফুজিয়ারাই তাঁর অভিভাবক হয়ে রাজকার্য পরিচালনা করতেন। নবম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এরা সম্রাটের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।

দ্বাদশ শতাব্দীতে আরও দুটি অভিজাত গোষ্ঠী ক্ষমতালাভের আশায় পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এরা হলেন **টায়রা** ও **মিনামোতো** পরিবার। প্রথমে টায়রা পরিবার জয়লাভ করে কিয়োটের রাজসভায় নিজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে মিনামোতো পরিবারের নেতা **ইয়োরিতোমো** টায়রাদের তাড়িয়ে দিয়ে ক্ষমতা দখল করে। ইয়োরিতোমো শোগান অর্থাৎ মহা-সেনাপতি উপাধি ধারণ করেন।

জাপানে মধ্যযুগের প্রথম দিকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা : মধ্যযুগের প্রথম দিকে জাপান ছিল কৃষিপ্রধান দেশ। কিন্তু এখানে অধিকাংশ জমি পার্বত্য উপত্যকা হওয়ায় কৃষিকাজের উপযোগী নয়। এখানকার মাত্র এক-অষ্টমাংশ জমিতে চাষ হয়। আয়তনের তুলনায় এখানকার লোকসংখ্যা বেশী। সেজন্য প্রতি বর্গমাইল জমিতে চাষ করে প্রায় দু'হাজার লোকের খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হয়। জাপানীরা পশুপালনে আগ্রহী ছিল না। একমাত্র মাছের চাষই ছিল জাপানের সর্বজনপ্রিয়। স্থানীয় চাহিদা পূরণ করতে কৃষিপণ্য ছিল প্রধান। এখানে বৈদেশিক বাণিজ্য ছিল না। ফলে কোন জিনিসের উৎপাদন বেশী হলেও বাইরে রপ্তানী হতো না এবং তার দ্বারা অর্থ নৈতিক অবস্থারও কোন উন্নতি হতো না। জাপানে খনিজ দ্রব্য থাকা সত্ত্বেও দক্ষ কারিগরের অভাবে ঐ সকল দ্রব্য কাজে লাগত না।

মিকাডোর চূড়ান্ত ক্ষমতা : জাপানের সম্রাটকে বলা হয় মিকাডো। জাপানের প্রচলিত ধারণা হলো মিকাডো হলেন সূর্য-সম্ভূত, আধা দৈবশক্তির ধারক ও বাহক এবং চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী। প্রাচীনকালে জাপানে প্রচলিত ছিল শিন্টো ধর্মমত। এই ধর্মমত অনুযায়ী মিকাডো বা জাপানের সম্রাট একাধারে হলেন শিন্টোধর্মের ঐতিহ্য অনুসারে দেশের প্রধান ধর্মীয় নেতা এবং পুরোহিত, আবার একচ্ছত্র রাজনৈতিক শাসন ক্ষমতারও অধিকারী। ইয়ামাতো সম্রাটের এই দ্বৈত ভূমিকা জাপানের ঐতিহাসিক বিকাশে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ শতকে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের ফলে জনসাধারণের শ্রদ্ধা সম্রাটের উপর থেকে কমে যায়। সেই সময় এই নতুন ধর্মমতের জন্য এবং রাজনৈতিক পটভূমিকায় সামন্ত গোষ্ঠীরা কর্তৃত্ব হাতে পায়। সম্রাট শুধুমাত্র মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী হয়ে পড়ে। শোগান সামন্তরাই সম্রাটের সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী হয়।

চীনের সঙ্গে সম্পর্ক : অতি প্রাচীনকাল থেকেই প্রতিবেশী রাষ্ট্র চীনের সঙ্গে জাপানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। জাপানের রাজনীতি, সমাজ ও অর্থ-নীতির উপর চীনাদের প্রভাব খুব বেশী। চীনদেশের উন্নত সভ্যতা অতি সহজেই জাপানীদের আকৃষ্ট করেছিল। প্রথম প্রথম নিজেদের অজ্ঞাতসারেই

জাপানীরা চীনাদের অনুকরণ করত। ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে পুরোপুরি সচেতন ভাবেই তারা আরও ব্যাপকভাবে চীনা সভ্যতা নিজেদের দেশে প্রসারিত করতে উদ্যোগী হয়। কয়েক শ' বছর ধরে বৌদ্ধধর্মের মধ্য দিয়েই চীনা সভ্যতা জাপানকে প্রভাবিত করে। বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে আরও জ্ঞানলাভের জন্য জাপানীরা চীনে যেত, তারপর ফিরে এসে তার প্রচারে আত্মনিয়োগ করত। ৬০৭ খৃষ্টাব্দে যুবরাজ শো-তোকুর উদ্যোগে এক বিরাট সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদল জাপান থেকে চীনে পাঠানো হয়। দীর্ঘকাল চীনে থেকে তরুণ জাপানী প্রতিনিধিরা সে দেশের দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, চিত্রকলা, সংগীত ইত্যাদি শিখে দেশে ফিরে আসার পর তাঁরাই নিজ নিজ বিষয়ে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। চীনা চিন্তাধারার প্রভাবে জাপানীরা ইয়ামাতো রাজ্যকে চীনের সমকক্ষ বলে ভাবতে আরম্ভ করে। চীনের কনফুসীয় তত্ত্বও জাপানে গৃহীত হয়েছিল। সপ্তদশ শতকে তোকুগাওয়া পরিবার শোগান পদ দখল করার পর থেকে কনফুসীয় মতবাদ জাপানে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে।

কেবল সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে নয়, রাজনৈতিক দিক দিয়েও জাপান ছিল চীনের অনুগামী। চীনের সম্রাটরা বারবার জাপান জয়ের জন্য চেষ্টা করে-ছিলেন, কিন্তু তাঁদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ৬৪৫ খৃষ্টাব্দে জাপানে চীনের অনুরূপ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। নবম শতাব্দীর পর থেকে তাঙ্ রাজাদের অধঃপতন শুরু হলে চীনের প্রতি জাপানীদের মনোভাবের পরিবর্তন হয়। দীর্ঘকাল চীনের সঙ্গে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ থাকায় জাপানেও একটি নিজস্ব ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল।

শোগান সামন্ততন্ত্র : 'শোগান' কথাটির অর্থ ই হলো প্রধান সেনাপতি। সামন্তদের মধ্যে শোগানরাই ছিলেন সবচেয়ে ক্ষমতাশালী। সম্রাটের পরেই এদের স্থান ছিল এবং সম্রাটের পরামর্শদাতাও ছিলেন এরা। এরাই প্রকৃত শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। শোগান পদের জন্য অন্যান্য সামন্তগণ চক্রান্ত শুরু করে এবং দলাদলি শুরু হয়। দীর্ঘ চারশ' বছর জাপানে এই অবস্থা চলার পর ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে

আনেন টোকুগাওয়া গোষ্ঠীর নেতা **ইয়েয়াসু**। এই বংশের উত্তরাধিকারিগণ ক্রমে ক্রমে ক্ষমতা বংশানুক্রমিক করে নেন এবং সাংবিধানিক সংস্কার প্রবর্তন করেন। এদের কর্মস্থল ছিল **ইয়েডো**। ইয়েয়াসু বংশের শোগানগণ আড়াইশ' বছরেরও বেশী জাপানের শাসনক্ষমতা পরিচালনা করেন।

সামুরাই : জাপানী সমাজ-ব্যবস্থায় সামন্তদের পরের স্থান ছিল যাদের, তাদের বলা হয় **সামুরাই**। এরা বংশ-পরম্পরায় ছিলেন সামরিক বাহিনীর লোক। এই সৈনিকদল গঠন করেছিলেন সামন্ত-প্রভুরা। এঁদের উপর ন্যস্ত ছিল দেশরক্ষার ভার, সামন্তগণের স্বার্থগত বিরোধের নিষ্পত্তি এবং কেন্দ্রীয় শক্তির বিরুদ্ধে সামন্তগণের আত্মরক্ষা। এঁরাও নানারকম সুবিধা ভোগ করতেন এবং অভিজাত বলে সম্মান পেতেন। টোকুগাওয়া শোগানদের সময়ে সামুরাইগণ বিদ্যাচর্চা ও শিল্পচর্চা প্রভৃতির দিকে মন দেয়।

শিভ্যালরি বা বুশিডো : ইউরোপের দেশগুলিতে যেমন সামন্ত-প্রথার সঙ্গে শিভ্যালরি নামে আচরণবিধি জন্ম নিয়েছিল, জাপানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। জাপানীরা একে বলতো বুশিডো অর্থাৎ বীরের ধর্ম। প্রাচীন ঐতিহ্য অনুযায়ী জাপানীরা নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনে করত। বিশিষ্ট কতকগুলি সামাজিক রীতি-নীতি মেনে নিয়ে তারা জাতীয় স্বাতন্ত্র্যকে বাঁচিয়ে রাখত। নিজেদের জাতির উপর বিশ্বাস রাখত ও গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করত। জাপানী শিভ্যালরির অন্যতম আদর্শ ছিল সম্রাটের আনুগত্য ও জাতীয় মর্যাদা রক্ষা করা। এই কর্তব্য পালনে অক্ষম হলে জাপানীরা আত্মহত্যা করত। জাপানী ভাষায় এর নাম **হারাকিরি**।

কালপঞ্জী

১. চীনে হান্ সাম্রাজ্যের অবসান—তৃতীয় খৃষ্টাব্দে।
২. চীনে মধ্যযুগের সময়পর্ব—৭০০-১৪০০ খৃষ্টাব্দ।
৩. সুই রাজবংশের শাসনকাল—৫৯০-৬১৮ খৃষ্টাব্দ।

৪. তাঙ্ বংশের শাসনকাল—৬১৮-৯০৭ খৃষ্টাব্দ।
৫. সুঙ্ বংশের শাসনকাল—৯০৭-১২৮০ খৃষ্টাব্দ।
৬. য়ুয়ান বংশের শাসনকাল—১২৮০-১৩৬৮ খৃষ্টাব্দ।
৭. জাপানে সামন্ত যুগের সূচনা—সপ্তম শতাব্দী।
৮. ফুজিয়ারা পরিবারের ক্ষমতার অবসান—দ্বাদশ শতাব্দী।
৯. শোগানতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা—দ্বাদশ শতাব্দী।

অনুশীলনী

মৌখিক প্রশ্ন * * * **এক নম্বর**

১. তাঙবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? ২. তাঙ্ আমলের একজন কবির নাম কর। ৩. চীনা সাহিত্যে ঋষি কবি কাকে বলা হয়? ৪. হিউয়েন-সাঙ্ কে ছিলেন? ৫. হিউয়েন সাঙ্ কত খৃষ্টাব্দে ভারতে আসেন? ৬. সুঙ্ বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? ৭. চীনে মোঙ্গল শাসনের প্রবর্তক কে? ৮. কুবলাই খান কত খৃষ্টাব্দে সুঙ্ সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন? ৯. মার্কো পোলো কে ছিলেন? ১০. শোগান বলতে কি বুঝ? ১১. দাইমিয়ো কাদের বলা হতো?

সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন * * * * * * * **৩ নম্বর**

১. চীনের ইতিহাসে কোন্ সময়কে স্বুবর্ণ যুগ বলা হয়? [৩]
২. হিউয়েন সাঙ ভারতবর্ষে এসেছিলেন কেন? [৩]
৩. সুঙ্ শাসনকালে বিখ্যাত ঐতিহাসিক কে ছিলেন? [৩]
৪. কুবলাই খানের রাজ্য বিস্তার বর্ণনা কর। [৩]
৫. মার্কো পোলোর সঙ্গে কুবলাই খানের সম্পর্ক আলোচনা কর। [৩]
৬. জাপানী সমাজে মিকাডোর ক্ষমতা সংক্ষেপে বর্ণনা কর। [৩]
৭. সামুরাই বলতে কি বোঝায় সংক্ষেপে বর্ণনা কর। [৩]
৮. জাপানীরা হারাকিরি করত কেন? [৩]

রচনাত্মক প্রশ্ন ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ **৯ নম্বর**

১. তাঙ্ যুগের ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষি ব্যবস্থা বর্ণনা কর। [৫+৪]

২. তাঙ্ রাজত্বকালে শিক্ষানীতির সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর। [৯]

৩. 'তাঙ্ রাজত্বকালে কাব্য সাহিত্যের অসাধারণ বিকাশ ঘটেছিল'— আলোচনা কর। [৯]

৪. তাঙ্ যুগে চীনের শিল্পকলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। [৯]

৫. সুঙ্ যুগের আইন প্রণয়ন সম্পর্কে যা জান লিখ। [৯]

৬. সুঙ্ যুগের শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিবরণ দাও। [৯]

৭. মার্কো পোলোর ভ্রমণ বৃত্তান্তে চীনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের যে চিত্র পাওয়া যায়, তাহা নিজের ভাষায় বর্ণনা কর। [৯]

৮. সামন্তযুগের সূচনাকালে জাপানের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার বিবরণ দাও। [৯]

৯. ফুজিয়ারা পরিবারের একচ্ছত্র শাসন জাপানে কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, তার বিবরণ দাও। অন্যান্য পরিবারের নাম উল্লেখ কর। [৭+২]

১০. জাপানী শাসনব্যবস্থায় সামুরাই ও শোগান সম্প্রদায়ের স্থান নির্ণয় কর। [৯]

বিষয়মুখী প্রশ্ন ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ **১ নম্বর**

১. তাঙ্ বংশের আগে চীনে কোন্ বংশ রাজত্ব করেছিল? ২. তাঙ্ বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট কে ছিলেন? ৩. হিউয়েন সাঙ্ কত বছর ভারতে অবস্থান করেছিলেন? ৪. কুবলাই খানের রাজত্ব কোথায় ছিল? ৫. মার্কো পোলো কোন্ দেশের লোক ছিলেন? ৬. জাপানের সম্রাটকে কি বলা হত?

একাদশ অধ্যায়



মধ্যযুগে ভারতবর্ষ

গুপ্ত-পরবর্তী যুগ (পঞ্চম থেকে সপ্তম শতাব্দী) : রোমান সম্রাটগণ ইউরোপে যেমন এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন, ঠিক তেমনিভাবে গুপ্তরাজগণ ভারতবর্ষের এক বিশাল অঞ্চল জুড়ে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী থেকে এই রাজবংশের অধীনে ভারতীয় সভ্যতা ধীরে ধীরে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছেছিল, কিন্তু পঞ্চম শতাব্দীতে বর্বর হূণ আক্রমণে এই বিশাল সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়ে। এই সময় অনেক সামন্তরাজা স্বাধীনতা ঘোষণা করায় গুপ্ত সাম্রাজ্যের অবসান তরান্বিত হয়। ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতে অনেকগুলি ছোট ছোট রাজ্য গড়ে ওঠে। নিজ নিজ প্রাধান্য বজায় রাখবার জন্য এই সব রাজারা প্রায়ই যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকতেন। এই সব রাজ্যের মধ্যে কোন রাজা শক্তিশালী হলেও ভারতকে আর ঐক্যবদ্ধ করতে পারেন নি।

হূণ আক্রমণ : হূণরা ছিল চীনের নিকটবর্তী মধ্য এশিয়ার এক অসভ্য যাযাবর উপজাতি। এরা কয়েকটি শাখায় ভাগ হয়ে যায়। এদের যে শাখাটি ইউরোপে অভিযান করে তারা ছিল **কৃষ্ণ হূণ**, এবং যে শাখাটি ভারত আক্রমণে অগ্রসর হয়, তারা ছিল **শ্বেত হূণ**। এই শ্বেত হূণরাই পারস্য থেকে খোটান পর্যন্ত ভূ-ভাগে তাদের আধিপত্য বিস্তার করেছিল। আফগানিস্তানের **বামিয়ান** নামক স্থানে শ্বেত হূণগণ রাজধানী স্থাপন করেছিল। হিন্দুকুশ পর্বতমালা অতিক্রম করে এরা ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হয়। গুপ্ত সম্রাট **স্কন্দগুপ্ত** এদের গতিরোধ করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর আনুমানিক ৪৯০ খৃষ্টাব্দে হূণ দলপতি **তোরমান** মধ্যভারত পর্যন্ত অধিকার করেন। তোরমানের পুত্র **মিহিরকুল** পাঞ্জাবের শাকল (শিয়ালকোট) নগরে রাজত্ব করতেন। পূর্ব মালব ও পাঞ্জাব তাঁর অধিকারে ছিল। আনুমানিক ৫৩২ খৃষ্টাব্দে মগধের গুপ্তরাজ **বালাদিত্য** এবং **মন্দাশোরের** অধিপতি মালবরাজ **যশোধর্মণ** মিহিরকূলকে পরাজিত করেন। ৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে

মিহিরকুলের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর হূণগণ ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে রাজত্ব করতে থাকে। এই সময় মগধের গৌরব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় এবং থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশ ও কনৌজের মৌখরী বংশ প্রাধান্য লাভ করে।

হূণ আক্রমণের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ঃ ভারতীয় সংস্কৃতিতে হূণদের কোন বিশিষ্ট অবদান নেই, বরং এদের আক্রমণে ভারতের অনেক সংস্কৃতির নিদর্শন ধ্বংস হয়ে যায়। এ ছাড়া গুপ্তযুগে ভারতবর্ষে যে বিশাল সাম্রাজ্য ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল, পঞ্চম শতকের মধ্যভাগ থেকে হূণদের আক্রমণে সেই কাঠামোটি ভেঙ্গে পড়ে। এটাই হলো ভারতবর্ষে হূণ আক্রমণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। হূণরা অবশেষে ভারতের জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মিশে ভারতীয় সংস্কৃতির ধারায় বিলীন হয়ে যায়। অনেকে মনে করেন, শক, হূণ, পল্লবদের রক্তের সঙ্গে ভারতীয় রক্তের সংমিশ্রণে সৃষ্টি হয়েছে রাজপুত জাতি।

গুপ্তযুগের পরবর্তী অবস্থা ঃ গুপ্ত সাম্রাজ্য ভেঙ্গে যাবার পর এবং সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দিকে হর্ষবর্ধনের উত্থানের মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত ভারতবর্ষ এক রাজনৈতিক সংকটের মধ্য দিয়ে চলেছিল। এই সময় উত্তর ভারতের যে সব রাজ্য প্রবল হয়ে উঠেছিল, তাদের মধ্যে মগধের গুপ্ত বংশ, কনৌজের মৌখরী বংশ, থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশ এবং সৌরাষ্ট্রের মৈত্রক বংশ অন্যতম। এ ছাড়া কামরূপের বর্মণবংশীয় রাজা ও গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠেন।

হর্ষবর্ধন শিলাদিত্য (৬০৬-৪৭ খৃঃ) হর্ষবর্ধনের পূর্বপুরুষেরা ছিলেন পুষ্যভূতিবংশীয় রাজা। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে এঁরা খুব শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। এই রাজ্যের প্রথম উল্লেখযোগ্য রাজার নাম প্রভাকরবর্ধন। এদের রাজধানী ছিল থানেশ্বর। ইনি হূণ, গুর্জর, মালব প্রভৃতি জাতি-উপজাতিকে পরাজিত করে মালব ও গুজরাটে তাঁর আধিপত্য বিস্তার করেন। তিনি কনৌজের মৌখরী বংশের রাজা গ্রহবর্মণের সঙ্গে তাঁর কন্যা রাজ্যশ্রীর বিবাহ দেন।

প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুর পর থানেশ্বরের রাজা হন তাঁর পুত্র **রাজ্যবর্ধন**। এই সময় গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক মালবরাজ দেবগুপ্তের সঙ্গে মিলিত হয়ে কনৌজের রাজা গ্রহবর্মণকে এক যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করেন। গ্রহবর্মণের স্ত্রী রাজ্যশ্রীও বন্দিনী হন। রাজ্যবর্ধন তাঁর ভগ্নীপতি গ্রহবর্মণকে হত্যার প্রতিশোধ ও বোন রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করার জন্য দেবগুপ্ত এবং শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এই যুদ্ধে রাজ্যবর্ধনের হাতে দেবগুপ্ত পরাজিত ও নিহত হন, কিন্তু গৌড়ের রাজা শশাঙ্কের কাছে রাজ্যবর্ধনকে পরাজিত হয়ে মৃত্যু বরণ করতে হয়।


হর্ষবর্ধন শিলাদিত্য

রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পর ৬০৬ খৃষ্টাব্দে **হর্ষবর্ধন** 'শিলাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করে থানেশ্বর ও কনৌজের সিংহাসনে বসেন। এরপর তিনি ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ এবং বোন রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করার জন্য কামরূপের রাজা **ভাস্করবর্মণের** সহযোগিতায় গৌড়ের রাজা শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। এই যুদ্ধে কে পরাজিত হয়েছিলেন তা সঠিকভাবে জানা যায় না। কিন্তু একথা সত্য যে, শশাঙ্ক যুদ্ধের পূর্বেই রাজ্যশ্রীকে ছেড়ে দিয়েছিলেন।

হর্ষবর্ধনের রাজ্যবিস্তার : গৌড় অভিযানের পর হর্ষবর্ধন মগধ, উড়িষ্যা, কঙ্গোদ প্রভৃতি রাজ্য জয় করেছিলেন। পূর্ব পাঞ্জাব এবং উত্তর প্রদেশও হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। হর্ষবর্ধন দাক্ষিণাত্য বিজয়ে অগ্রসর হন, কিন্তু তিনি **চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর** কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। তাঁর সাম্রাজ্য মোটের উপর কয়েকটি অঞ্চল ব্যতীত উত্তর ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এইজন্য হর্ষবর্ধন **'উত্তরপথনাথ'** অর্থাৎ ভারতের সার্বভৌম অধীশ্বররূপে কোনো কোনো শিলালিপিতে বর্ণিত হয়েছেন।

হর্ষবর্ধন কেবল যোদ্ধাই ছিলেন না। তিনি ছিলেন প্রজাবৎসল শাসক।

এই সব গুণের জন্য ভারতের রাজাদের মধ্যে সম্রাট অশোকের পরই তাঁর স্থান। তিনি রাজ্যের সর্বত্র ঘুরে ঘুরে প্রজাদের সুখদুঃখের কথা শুনতেন। প্রজাদের উপর কোথাও কোন অত্যাচার হলে তার প্রতিকার করতেন। প্রজাদের সুখ-সুবিধার জন্য তিনি রাজ্যের নানা জায়গায় সরাইখানা, বিশ্রামাগার, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি স্থাপন করেন। হর্ষবর্ধনের শাসনকালে ভারত ও চীনের মধ্যে সংস্কৃতির সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়। হিউয়েন সাঙের ভারত ভ্রমণ, ভারত ও চীনের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে।

হিউয়েন সাঙ্-এর বিবরণ ঃ হিউয়েন সাঙ্ চীন দেশের একজন বৌদ্ধ পরিব্রাজক। তিনি আনুমানিক ৬৩০ খৃষ্টাব্দ থেকে ৬৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে অবস্থান করেন। ভারতের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করে তিনি যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছিলেন, তা থেকে আমরা তৎকালীন ভারতবর্ষের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতির জীবনের নানা মূল্যবান তথ্য জানতে পারি। তাঁর বর্ণনা থেকে হর্ষবর্ধনের আমলে প্রবর্তিত শাসন-ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক অবস্থা ও সভ্যতা-সংস্কৃতির কথাও বিশেষভাবে জানা যায়।


হিউয়েন সাঙ্

হিউয়েন সাঙ্ তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে হর্ষবর্ধনকে সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা বলে উল্লেখ করেছেন। হর্ষবর্ধনের শাসনকালে ভারতবাসীর আড়ম্বরহীন জীবনযাত্রা ও সরলতা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। ভারত ছিল সমৃদ্ধশালী দেশ এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান যথেষ্ট উন্নত ছিল। তাঁর বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ঐ সময় সমগ্র উত্তর-ভারতে পাটলিপুত্র শহরের পরিবর্তে কনৌজ পরিণত হয় সমৃদ্ধশালী প্রধান শহরে।

ভারতের সমাজ-জীবনে হিউয়েন-সাঙ্ জাতিভেদ প্রথা লক্ষ্য করেছিলেন। হিন্দুসমাজ নানা জাতি-বর্ণে বিভক্ত ছিল। ব্রাহ্মণেরা ধর্মীয় অনুষ্ঠান

পরিচালনায়, ক্ষত্রিয়েরা দেশ শাসনের কাজে, বৈশ্যরা ব্যবসা-বাণিজ্যে এবং শূদ্ররা কৃষিকাজেই ব্যয় করতেন তাঁদের শ্রম।

এই সময় ভারতে বস্ত্র-বয়ন শিল্পের উন্নতির কথা হিউয়েন সাঙ্ বর্ণনা করেছেন। সমুদ্রপথে ভারতীয়রা বিদেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যেও রত ছিল। বাংলাদেশের তাম্রলিপ্ত ছিল একটি প্রখ্যাত বাণিজ্য-বন্দর।

হর্ষবর্ধনের শাসন-ব্যবস্থার সুখ্যাতি করে তিনি বলেছেন, প্রশাসনিক কর্তব্য পালনে হর্ষবর্ধনের কোনো ক্লান্তি ছিল না। তিনি বছরের অধিকাংশ সময় তাঁর সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে শাসনকার্য পরিদর্শন করার জন্য ঘুরে বেড়াতেন। অপরাধীদের জন্য ছিল কঠোর শাস্তিদানের ব্যবস্থা। বৌদ্ধ-ধর্মের অনুশাসন অনুযায়ী সমাজ-জীবনে নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষা করা হতো। হর্ষবর্ধনের বিরাট এক সামরিক বাহিনী ছিল। এই বাহিনী গড়ে উঠেছিল ৫০ হাজার পদাতিক এবং ১ লক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে। সামরিক বাহিনী সীমান্ত অঞ্চল পাহারা দিত এবং বিশৃঙ্খলা দমনেও সাহায্য করত।

হর্ষবর্ধনের সময় বিনা পয়সায় বাধ্যতামূলক শ্রম চালু ছিল না। সাধারণ মানুষ তাদের শ্রমার্জিত সম্পদ শান্তিতে ভোগ করতে পারতেন। করভারে মানুষ জর্জরিত ছিল না। রাজার খাস জমিতে চাষ-আবাদ করলে উৎপন্ন ফসলের এক-ষষ্ঠাংশই মাত্র কর হিসেবে দিতে হতো। সাধারণভাবে জনগণের নৈতিক মানও ছিল উন্নত।

হিউয়েন সাঙ্-এর বিবরণ থেকে আমরা হর্ষবর্ধনের ধর্মীয় মনোভাবের কথাও জানতে পারি। তিনি লিখেছেন, হর্ষবর্ধন প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর একটি ধর্ম-সম্মেলন আহ্বান করতেন। এই সম্মেলন 'মহামোক্ষ পরিষদ' নামে পরিচিত ছিল।

হর্ষবর্ধনের সময় গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে প্রয়াগ নামক জায়গায় প্রতি পাঁচ বছর অন্তর একটি বিরাট মেলারও আয়োজন করা হতো। এইরূপ একটি মহামেলায় হিউয়েন সাঙ্ উপস্থিত ছিলেন। এই মেলায় শিব, বুদ্ধ ও সূর্যদেব—এই তিন দেবতার উদ্দেশ্যে পূজা নিবেদন করা হতো। পূজার শেষে সম্রাট হর্ষবর্ধন ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ, সাধু-সন্ন্যাসী তথা জাতিধর্ম নির্বিশেষে

সকল প্রার্থীকে ধন-রত্ন ও অর্থ দান করতেন। হিউয়েন সাঙ্ লিখেছেন, যখন সব ধন-রত্ন ফুরিয়ে যেত, তখন হর্ষবর্ধন নিজের বহুমূল্য বস্ত্রখণ্ড পর্যন্ত দান করে একখণ্ড সামান্য বস্ত্র পরিধান করে ভিক্ষুকের বেশ ধারণ করতেন।

মোটকথা, হিউয়েন সাঙ্-এর বিবরণ প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এক অমূল্য সম্পদ।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় : প্রাচীন ভারতে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র ছিল নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়। হিউয়েন সাঙ্ দীর্ঘকাল নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান করে বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র চর্চা করেছিলেন। ভারতের তৎকালীন সকল নৃপতি ও ধনী ব্যক্তির অকৃপণ দানে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি পরিচালিত হতো। বহির্ভারতের হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের দানেও এটি পরিপুষ্ট হয়।

অনেকগুলি বিরাট ভবন নিয়ে গঠিত হয়েছিল নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌহদ্দির মধ্যে সারিবদ্ধভাবে বিরাজ করত ৮টি কলেজ বা মহাবিদ্যালয়। হিউয়েন সাঙ্-এর বিবরণ থেকে জানা যায়, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে



নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ

আবাসিক ছাত্র ও শিক্ষকের সংখ্যা ছিল দশ হাজারেরও বেশি। এইসব ছাত্র ও শিক্ষক এসেছিলেন কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া, জাপান, চীন, তিব্বত, সিংহল, বুখারা প্রভৃতি দেশ এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। বাঙালী পণ্ডিত

শীলভদ্র সেই সময়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি ছিলেন সে যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষী ও দার্শনিক।

কেবল বৌদ্ধশাস্ত্র নয়, এখানে বেদ, ন্যায়শাস্ত্র, ব্যাকরণ, সাংখ্য, দর্শন, চিকিৎসাবিদ্যা ইত্যাদিও পড়ান হতো। প্রতিদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত একশ' জন শিক্ষক ঐ সব বিষয় ছাত্রদের কাছে ব্যাখ্যা করতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত ব্যয় নির্বাহের জন্য একশ'টি গ্রামের রাজস্ব দেওয়া হতো। এখানকার পড়াশুনার মান খুবই উন্নত ছিল। বিদ্যাচর্চার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের নৈতিক চরিত্র গঠনের দিকেও নজর রাখা হতো। নালান্দায় অধ্যয়ন শেষ করে যাঁরা উপাধি নিয়ে বেরোতেন, সমাজে তাঁদের স্থান ছিল উঁচু। হিউয়েন সাঙ্ এবং অন্যান্য বিদেশী ভ্রমণকারীগণের বিবরণে ভারতবাসীর সৎ এবং সরল জীবনযাত্রার যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়েছে, তার মূল কারণ হলো এই ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ শিক্ষা-ব্যবস্থা।

হর্ষ-পরবর্তী যুগ (৮ম থেকে ১১শ শতাব্দী) : হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর তাঁর সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে। এই সময় উত্তর ভারতে কনৌজ, কামরূপ মগধ ও কাশ্মীর প্রভৃতি ছোট ছোট রাজ্যের উদ্ভব হয়। এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভের জন্য পরস্পর বিরোধ লেগে থাকত।

কনৌজ : এই রাজ্যটি হর্ষবর্ধনের রাজ্যভুক্ত ছিল। হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর অর্জুন বা অরুণাশ্ব নামক একজন মন্ত্রী কনৌজে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। একজন চীনা দূতকে অপমান করায় তিনি তিব্বতরাজের হাতে বন্দী হন। অষ্টম শতাব্দীর প্রথম দিকে যশোবর্মণ নামে এক রাজা পুনরায় কনৌজকে ভারতের অন্যতম প্রধান রাজ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইনি ছিলেন বিদ্যোৎসাহী রাজা। সংস্কৃত কবি **ভবভূতি** এবং **বাকপতি** যশোবর্মণের সভাপণ্ডিত ছিলেন। বাকপতি লিখিত কাব্য **গৌড়বহো** থেকে জানা যায়, যশোবর্মণের কাছে গৌড়রাজ পরাজিত হয়েছিলেন। যশোবর্মণ দক্ষিণে নর্মদা তীর থেকে পশ্চিমঘাট পর্বত পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চল অধিকার করেছিলেন। যশোবর্মণ কাশ্মীররাজ **মুক্তাপীড় ললিতাদিত্যের** সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। সঙ্গে সঙ্গে কনৌজের গৌরব সাময়িকভাবে লুপ্ত হয়।

কামরূপ : ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার কামরূপ রাজ্যটি শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। কামরূপরাজ ভাস্করবর্মণ শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধে হর্ষবর্ধনকে সাহায্য করেছিলেন। হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর ইনি তিব্বতীয়দের কনৌজ আক্রমণে সাহায্য করেন। ভাস্করবর্মণ গৌড়রাজ্যের একাংশ অধিকার করেছিলেন। এই সময় কামরূপ পূর্ব-ভারতের একটি উল্লেখযোগ্য রাজ্যে পরিণত হয়।

মগধ : গুপ্তবংশের রাজত্বকালে মগধ ছিল গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য। ষষ্ঠ শতাব্দীতে পরবর্তী গুপ্তরাজগণের রাজধানী ছিল মগধ। গৌড়রাজ শশাঙ্ক মগধ অধিকার করেন। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর পরবর্তী গুপ্তবংশের **আদিত্য সেন** হর্ষবর্ধনের সাহায্যে মগধ অধিকার করেন। কনৌজরাজ যশোবর্মণ **দ্বিতীয় জীবিতগুপ্তের** রাজত্বকালে পুনরায় মগধ দখল করেন।

কাশ্মীর : উত্তর ভারতের এক শক্তিশালী রাজ্য হলো কাশ্মীর। এখানে কর্কট বংশীয় রাজা চন্দ্রাপীড়কে চীন সম্রাট কাশ্মীরের রাজারূপে স্বীকৃতি দেন। চন্দ্রাপীড়ের ভাই ললিতাদিত্য **মুক্তাপীড়** কনৌজরাজ যশোবর্মণের সাহায্যে তিব্বতরাজকে পরাজিত করেন। শেষে যশোবর্মণের সঙ্গে এক বিবাদের ফলে কনৌজ, কামরূপ, মগধ ও কলিঙ্গ প্রভৃতি কাশ্মীর রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়। ললিতাদিত্য মালব, গুজরাট, এবং সিন্ধুদেশের আরবগণকেও পরাজিত করেছিলেন।

রাজপুত জাতি ও রাজপুত রাজ্য : হর্ষবর্ধনের পরবর্তীকালে প্রায় চারশ' বছর ধরে উত্তর ভারতে রাজপুত জাতি প্রাধান্য বিস্তার করে। মুসলমান আক্রমণের প্রতিরোধে রাজপুত রাজাগণের অপরিসীম কৃতিত্ব দেখা যায়। রাজপুতগণ অনেকগুলি শাখায় বিভক্ত ছিল। এদের অনেকেই পৌরাণিক যুগের ক্ষত্রিয় রাজাদের বংশধর বলে পরিচয় দিত। কিন্তু অনেক ইতিহাসবিদের মতে এঁরা শক, হূণ প্রভৃতি জাতির উত্তরপুরুষ। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে এঁরা আক্রমণকারীরূপে এদেশে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন। ধীরে ধীরে এরা ভারতীয় রীতি-নীতি গ্রহণ করে

ভারতীয় সমাজভুক্ত হয়ে পড়ে। এদের মধ্যে গুর্জর, প্রতিহার, পরমার, চন্দেল্ল, চালুক্য, গাহড়বাল ও চৌহান বংশীয় রাজ্য অন্যতম।

গুর্জর-প্রতিহার রাজ্য ঃ মধ্য এশিয়ার গুর্জরগণ হূণদের সঙ্গে ভারতে প্রবেশ করে। গুর্জরদের অপরএকটি শাখা হলো প্রতিহারগণ। গুর্জরগণ ষষ্ঠ শতকে দক্ষিণ রাজপুতনা অঞ্চলে এক বৃহৎ রাজ্য স্থাপন করে। এদের রাজধানীর নাম ভিনমল। পরবর্তী সময়ে মালব দেশে একটি প্রতিহার রাজ্য গড়ে উঠে। ৭২৫ খৃষ্টাব্দে প্রতিহার রাজ প্রথম নাগভট্ট আরবদের পরাজিত করেন।

এই বংশের চতুর্থ রাজা **বৎসরাজ** ও পঞ্চম রাজা **দ্বিতীয় নাগভট্ট** রাষ্ট্রকূট ও পালবংশের সঙ্গে ত্রিমুখী সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। **প্রথম ভোজের** রাজত্বকালে পূর্ব পাঞ্জাব থেকে গৌড়ের সীমা পর্যন্ত প্রতিহার বংশ আধিপত্য বিস্তার করে। তাঁর আমলেই ভিনমল থেকে রাজধানী কনৌজে স্থানান্তরিত করা হয়। মুঙ্গেরের যুদ্ধে তিনি গৌড়রাজকে পরাজিত করেন। রাজা **প্রথম ভোজই** উত্তর ভারতে রাজপুত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর পুত্র মহেন্দ্রপাল এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন। **কর্পূর মঞ্জরী** নামক নাটকের রচয়িতা কবি **রাজশেখর** মহেন্দ্রপালের সভাসদ ছিলেন। তাঁর শাসনকালে সিন্ধু সীমান্ত থেকে পুণ্ড্রবর্ধন (উত্তর বঙ্গ) অর্থাৎ আরবসাগর থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত প্রতিহার সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল।

মহেন্দ্রপালের পর প্রতিহার সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়। তাঁর পুত্র প্রথম মহীপাল রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় **ইন্দ্রের** কাছে পরাজিত হন, এবং তৃতীয় ইন্দ্র কনৌজ লুণ্ঠন করে। এরপর নানা স্থানে ছোট বড় অনেকগুলি রাজ্য স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ১০১০ খৃষ্টাব্দে সুলতান মামুদ কনৌজ লুণ্ঠন করেন। এর কিছুকাল পরে প্রতিহার বংশের শেষ রাজা **রাজ্যপাল** আততায়ীর হস্তে নিহত হলে, গাহড়বাল রাজপুতগণ কনৌজ অধিকার করেন।

পরমার রাজ্য ঃ মালবের পরমারবংশীয় রাজগণ খৃষ্টীয় দশম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁদের রাজধানী ছিল **ধারানগরীতে**। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা **কৃষ্ণরাজ** রাষ্ট্রকূটদের অধীনে মালবের শাসনকর্তা

ছিলেন। দশম শতাব্দীর শেষভাগে দ্বিতীয় **বাক্‌পতির** রাজত্বকালে পরমার বংশ বিশেষ শক্তিশালী হয়ে উঠে। এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা **ভোজদেব** কাব্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। ত্রয়োদশ শতকে দিল্লীর সুলতান **ইলতুৎমিস** মালব অধিকার করেন।

চন্দেল্ল রাজ্য : চন্দেল্ল রাজগণ খৃষ্টীয় নবম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত রাজত্ব করেন। খাজুরাহো ছিল এই রাজ্যের রাজধানী। যশোবর্মন এই বংশের প্রথম উল্লেখযোগ্য রাজা। তিনি কালিঞ্জর দুর্গ জয় করে উত্তরে যমুনাতীর পর্যন্ত রাজ্যবিস্তার করেন। গোণ্ড এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন। তিনি সুলতান মামুদকে প্রতিহত করেছিলেন। রাজধানী খাজুরাহোতে চন্দেল্লগণ যে জৈন মন্দির নির্মাণ করেছিলেন, তা ভারতের শ্রেষ্ঠ মন্দিরগুলির অন্যতম।

চৌলুক্য রাজ্য : চৌলক্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা **মুলরাজ** দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে গুজরাটে আধিপত্য স্থাপন করেন। **অনহিলবাড়** বা **পাটন** ছিল চৌলুক্যদের রাজধানী। এই বংশের রাজা **প্রথম ভীমের** রাজত্বকালে গজনীর সুলতান মামুদ সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠন করেন। **দ্বিতীয় মুলরাজ** এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন। তুর্কীদের বিরুদ্ধে তিনি জয়লাভ করেন। **বাঘেলা** বংশ চৌলুক্য বংশের একটি শাখা। চৌলুক্য বংশ দুর্বল হয়ে পড়লে, বাঘেলা রাজপুতগণই রাজত্ব করতে থাকেন। এই বংশের শেষ রাজা **কর্ণের** সময় সুলতান আলাউদ্দীন খলজী গুজরাট জয় করেন।

গাহড়বাল রাজ্য : কনৌজ ও বারাণসী ছিল গাহড়বাল রাজপুতগণের প্রধান নগর। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যেই এই বংশ উত্তর ভারতে প্রাধান্য বিস্তার করে। এই বংশের বিখ্যাত রাজা ছিলেন **জয়চাঁদ** বা **জয়চন্দ্র**। জয়চাঁদের কন্যা সংযুক্তার স্বয়ম্বর নির্বাচনের ব্যাপারে পৃথ্বীরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য মহম্মদ ঘুরীকে উৎসাহ দেন। তরাইনের যুদ্ধে জয়চাঁদ পৃথ্বীরাজকে কোন সাহায্য করেন নি। মহম্মদ ঘুরীর সেনাপতি কুতবউদ্দীন আইবক ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে **চন্দ্রাবারের** যুদ্ধে

জয়চাঁদকে পরাজিত ও নিহত করেন। গাহড়বাল বংশ মাত্র একশ' বছর রাজত্ব করেছিল।

চৌহান রাজ্য : খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রাজপুতনার **সম্ভর** অঞ্চলে **অজয়দেব চৌহান** অজয়মেরু বা **আজমীর** নগর স্থাপন করেন। অজয়দেবের পৌত্র **বিগ্রহরাজ** দিল্লী জয় করেন। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র **পৃথ্বীরাজ চৌহান** এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। মহম্মদ ঘুরীর বিরুদ্ধে উত্তর ভারতের রাজাদের তিনি নেতৃত্ব করেছিলেন। তরাইনের প্রথম যুদ্ধে তিনি মহম্মদ ঘুরীকে পরাজিত করেন, কিন্তু দ্বিতীয়বারের যুদ্ধে ঘুরীর কাছে পৃথ্বীরাজ শোচনীয়ভাবে পরাজয় ও মৃত্যু বরণ করেন।

পাল-প্রতিহার-রাষ্ট্রকূট সংঘর্ষ : মধ্যযুগে কনৌজ ছিল সবচেয়ে সমৃদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য। এই কনৌজে আধিপত্য বিস্তারের জন্য অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে পাল-প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূট রাজাদের মধ্যে প্রায় একশ' বছর ধরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছিল। পাল রাজারা প্রথমে কনৌজ অধিকার করেন। প্রতিহারগণ দু'বার তাদের বিতাড়িত করেন। কিন্তু রাষ্ট্রকুট শক্তির কাছে দু'বারই তাঁরা পরাজিত হন, শেষ পর্যন্ত পালবংশই কনৌজে আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়।

বঙ্গদেশ

শশাঙ্ক (আনুমানিক ৬০৬-৬৩৮ খৃ:) : সপ্তম শতকের প্রথম দিকে **শ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্ক** নামে একজন স্বাধীন রাজা গৌড়ে রাজত্ব করতেন। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, শশাঙ্ক প্রথমে গুপ্তরাজ মহাসেন-গুপ্তের অধীনে একজন মহাসামন্ত ছিলেন। ৬০৬ খৃষ্টাব্দে শশাঙ্ককে কর্ণসুবর্ণের (বর্তমান মুর্শিদাবাদের কানসোনা) রাজা রূপে দেখা যায়। উত্তর এবং পশ্চিমবঙ্গের কিছু অংশ নিয়ে গঠিত গৌড়রাজ্য ছিল তাঁর শাসনাধীন। কূটনীতি ও রণনীতিতে তাঁর সমান দক্ষতা ছিল। শশাঙ্কের নেতৃত্বে গৌড়ের সমৃদ্ধি ও প্রতিপত্তি দিন দিন বাড়তে থাকে এবং বাঙালী জাতি সর্বপ্রথম

ভারতের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে অগ্রসর হয়। উড়িষ্যার কঙ্গোদ রাজ্য শশাঙ্কের বশ্যতা স্বীকার করে। কনৌজের মৌখরী বংশের সঙ্গে গৌড়ের রাজাদের দীর্ঘদিন ধরে মনোমালিন্য ছিল। শশাঙ্ক প্রথমে মালবের রাজা দেবগুপ্তের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন, অতঃপর তাঁরা একসঙ্গে কনৌজ আক্রমণ করেন। কনৌজরাজ গ্রহবর্মণ পরাজিত ও নিহত হন এবং তাঁর পত্নী রাজ্যশ্রী শশাঙ্কের হাতে বন্দিনী হন। থানেশ্বররাজ রাজ্যবর্ধন ছিলেন রাজ্যশ্রীর ভাই। তিনি শত্রুদের বাধা দিতে সসৈন্যে অগ্রসর হলেন। রাজ্যবর্ধন দেবগুপ্তকে পরাজিত করেন, কিন্তু রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করার আগেই শশাঙ্কের কুট চক্রান্তে নিহত হলেন। এরপর হর্ষবর্ধন শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। তিনি শশাঙ্কের বিরুদ্ধে কামরূপরাজ ভাস্করবর্মনের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন। কিন্তু শশাঙ্ককে পরাজিত করতে পেরেছিলেন কিনা সন্দেহ। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত শশাঙ্ক গৌড়, কর্ণসুবর্ণ, বুদ্ধগয়া ও উৎকল অঞ্চলে সগৌরবে রাজত্ব করেছিলেন। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর মগধ ও গৌড় হর্ষবর্ধনের অধিকারে আসে।

পাল ও সেনযুগে বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনঃ শশাঙ্কের মৃত্যুর পর প্রায় একশ' বছর ধরে বাংলায় অরাজকতা চলে। পরে পাল ও সেন বংশের রাজারা এখানে সগৌরবে রাজত্ব করেন। হিউয়েন সাঙের বিবরণ ও সমসাময়িক সাহিত্য থেকে পাল ও সেন রাজাদের আমলে বাংলার জীবনযাত্রা সম্পর্কে কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। হিউয়েন সাঙ বঙ্গদেশের অধিবাসীদের সম্পর্কে যে বিবরণ রেখে গেছেন, তা থেকে জানা যায় যে, তারা সাধু, অমায়িক, শ্রম-সহিষ্ণু দৃঢ় এবং সাহসী ছিল। শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি তাদের অনুরাগ ছিল অসাধারণ। জ্ঞানলাভের জন্য তারা দূরদেশে যেতেও কুণ্ঠিত হতো না। বেদ, মীমাংসা, ধর্মশাস্ত্র, গণিত, জ্যোতিষ, ব্যাকরণ, আয়ুর্বেদ প্রভৃতি প্রধান শিক্ষণীয় বিষয় ছিল। সেকালে বাঙালী মেয়েদের খুব সম্মান ছিল। তাঁরা লেখাপড়া শিখতেন এবং সমাজে তাঁদের স্থান ছিল খুব উঁচুতে।

নারী জাতির অবরোধ প্রথা ছিল না। বাংলার অধিবাসীদের

বেশীসংখ্যক লোক তখন গ্রামে বাস করত। সাধারণ বাঙালীর জীবনযাত্রায় মোটামুটি স্বাচ্ছল্য ছিল। কৃষি ও শিল্প ছিল তাদের উপজীবিকা। বাংলাদেশে সম্পদশালী নগরের অভাব ছিল না। নগরের প্রশস্ত রাজপথের দু'পাশে সারিবদ্ধ ভাবে বাড়ি তৈরি হতো। নগরের মধ্যে স্থানে স্থানে সরোবর, উদ্যান, মন্দির ইত্যাদি ছিল।

ভাত, মাছ, মাংস, তরি-তরকারি, ঘি এবং দুধ ছিল বাঙালীর প্রধান খাদ্য। বঙ্গদেশে উৎকৃষ্ট গুড় এবং চিনি তৈরি হতো। সেকালের বাঙালীদের বেশভূষা ছিল অত্যন্ত সাধারণ মানের। পুরুষ ও নারী একখানা করে ধুতি ও শাড়ী ব্যবহার করত। পুরুষেরা চাদর ও মেয়েরা ওড়না দিয়ে শরীরের উর্ধ্বাঙ্গ আবৃত করত। পুরুষ ও নারী উভয়েই অলংকার পরতে ভালবাসত। সেকালের সাহিত্যে চামড়ার জুতা ও কাঠের খড়মের উল্লেখ পাওয়া যায়।

সেকালের সমাজে নানা রকমের খেলা-ধূলা ও উৎসব অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল। নাচ-গান-অভিনয়, দাবা ও পাশাখেলা এবং কুস্তি প্রভৃতি বাঙালীর প্রধান আনন্দ উৎসবও অবসর বিনোদনের অঙ্গ ছিল।

কৃষিকর্ম বাঙালীর প্রধান উপজীবিকা হলেও সেকালে বাঙালী শিল্প ও বাণিজ্যে যথেষ্ট উন্নত ছিল। বস্ত্রশিল্পে বাংলা অতি প্রাচীনকাল থেকেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। বাংলার মসলিন ও কার্পাস বস্ত্রের খ্যাতি, ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। বাংলার সূক্ষ্মবস্ত্র দেশ-বিদেশে চালান যেত।

স্থাপত্য, ভাস্কর্য, কারুশিল্প ও চিত্রাঙ্কন-বিদ্যায় বাঙালী দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিল। বাঙলার ভিতর পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য বড় বড় হাট ও গঞ্জ গড়ে উঠেছিল। দেশে নদ-নদী ও রাস্তা থাকায় শিল্পজাত দ্রব্যাদি স্থান থেকে স্থানান্তরে পাঠাতে অসুবিধা হতো না। সমুদ্রপথেও বাঙলার ব্যবসা বাণিজ্য চলত। স্থলপথে—নেপাল, ভুটান ও তিব্বতের সঙ্গে বাণিজ্য চলাচল ছিল। তাম্রলিপ্ত (বর্তমানে তমলুক) সে যুগে পূর্ব-ভারতের শ্রেষ্ঠ বন্দর ছিল।

প্রাচীন সাহিত্য, শিলালিপি ও বৈদেশিক ভ্রমণকারীদের বিবরণ থেকে জানা যায়, সেকালে বাংলায় কারুকার্যময় অট্টালিকা, মন্দির, স্তূপ ও বিহার ছিল। প্রাসাদ ও মন্দিরগুলি সাধারণতঃ ইট দিয়ে তৈরি হতো। বঙ্গ, দেশের আবহাওয়া আর্দ্র হওয়ায় এগুলি সবই প্রায় ধ্বংস হয়েছে। তবুও দু'হাজার বছরের অতীত কীর্তির ভগ্ন নিদর্শন যা পাওয়া যায়, তা থেকে বাংলার শিল্প-ভাস্কর্যের উৎকর্ষের খানিকটা পরিচয় পাওয়া যায়। উত্তর বাংলায় ধর্মপাল নির্মিত **সোমপুর বিহার** এককালে বৌদ্ধ জগতে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিল। বৃহৎ বঙ্গ জুড়ে আরও অসংখ্য মন্দির, বিহার ও শিক্ষায়তন প্রভৃতি কালের ধ্বংসশক্তিকে অগ্রাহ্য করে আজও প্রাচীন শিল্প-স্থাপত্যের মহিমা ঘোষণা করছে।

প্রাচীন বাংলার শিক্ষা ও ধর্মচর্চা : বাঙলায় হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম উভয়েরই প্রসার হয়েছিল। পালরাজাগণ বৌদ্ধধর্ম এবং সেনরাজগণ হিন্দু-ধর্মের পক্ষপাতী ছিলেন। **সোমপুর, ওদন্তপুর** এবং বিক্রমশীলার বিহার-গুলি পালযুগেই নির্মিত হয়েছিল। সেনবংশীয় রাজগণ ছিলেন বিষ্ণু উপাসক।



সোমপুর মহাবিহার

তাঁদের যুগে বেদ-বিধি অনুযায়ী যাগযজ্ঞ পালন করা হতো এবং স্মৃতিশাস্ত্র অনুযায়ী সব রকম সংস্কার পালন করা হতো। এই সময় সাহিত্যচর্চাও

অনেক উন্নত ছিল। প্রাকৃত এবং সৌরসেনী প্রভাব কাটিয়ে বাঙলা ভাষা এই সময় থেকেই নিজস্ব রূপ গ্রহণ করে। এই সময়ে চর্যাপদগুলি রচিত হয়। সন্ধ্যাকর নন্দীর **রামচরিত**, জয়দেবের **গীতগোবিন্দ**, ধোয়ীর **পবনদূত** প্রভৃতি প্রধান সাহিত্যগুলি এই সময়েই রচিত হয়।

পাল ও সেনরাজগণ বিদ্যানুরাগী ছিলেন। তাঁদের আনুকল্য লাভ করায় প্রতি পরিবারেই বিদ্যাচর্চা করা হতো। জ্ঞানলাভের আশায় শিক্ষার্থীরা দূর-দূরান্তের শহরগুলিতে এবং কাশ্মীরেও হাঁটাপথে যেতে দ্বিধা করত না। বাঙালীদের বেশী আকর্ষণ ছিল—বেদ, নানা ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ, ন্যায়, স্মৃতি, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, গণিত ও আয়ুর্বেদ বিদ্যার উপর। পাল-নির্মিত মঠগুলিতে নানা বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল।

বিক্রমশীলা মহাবিহার : বর্তমান ভাগলপুরের কাছে গঙ্গাতীরে একটি পাহাড়ের উপর এই বিহারটি নিমিত হয়েছিল। পালবংশের রাজা ধর্মপাল এই বিহারটি নির্মাণ করেন। এখানে ছিল একটি প্রধান মন্দির এবং সেই মন্দিরকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছিল আরও একশ' সাতটি মন্দির। এছাড়া বিদ্যাশিক্ষার জন্য ছিল ছ'টি মহাবিদ্যালয়। **রাহুল**, **ভদ্র**, **শান্তরক্ষিত**, **কল্যাণরক্ষিত** প্রভৃতি আচার্যগণ এখানে শিক্ষাদান করতেন। মহাপণ্ডিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ এই মহাবিহারের প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন। তিব্বত, নেপাল প্রভৃতি দেশ থেকে শিক্ষার্থীরা এখানে শিক্ষাগ্রহণ করতে আসতেন।

ওদন্তপুর মহাবিহার : পালরাজগণ মগধে ওদন্তপুর মহাবিহারটিও নির্মাণ করেন। এখানে বৌদ্ধধর্মশাস্ত্র এবং দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হতো। শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় সাফল্যলাভ করে এখানে প্রবেশ করতে হতো। এখানকার প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন **আচার্য শীলরক্ষিত**।

দক্ষিণ ভারত

বাদামী বা বাতাপীর চালুক্য বংশ : চালুক্যগণ উত্তর ভারতের রাজপুত নামে নিজেদের পরিচয় দিত। কিন্তু খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ডঃ রমেশ

চন্দ্র মজুমদার এদের কানাড়ী জাতির লোক বলে অভিহিত করেছেন। চালুক্য বংশের অভ্যুত্থান থেকেই শুরু হয়েছে দক্ষিণ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস।

এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা **প্রথম পুলকেশী** ষষ্ঠ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে বিজাপুর জেলার বাতাপিপুর বা বাদামীতে চালুক্য রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। একটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করে তিনি নিজের কীর্তি অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। প্রথম. পুলকেশীর পুত্র **কীর্তিবর্মণ** ছিলেন চালুক্য বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। ভারতের পূর্ব উপকূল থেকে উত্তরে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত তাঁর রাজ্য বিস্তৃত হয়েছিল। এছাড়া অনেকে মনে করেন অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ ও দ্রাবিড় তাঁর অধিকারভুক্ত হয়েছিল এবং পশ্চিম উপকূলবর্তী মহীশূর ও ত্রিবাঙ্কুরের কিয়দংশও তিনি জয় করেন। কীর্তিবর্মণের পর তাঁর ভাই **মঙ্গলেশ** কিছু-দিনের জন্য চালুক্য সিংহাসনে বসেন। কিন্তু তিনি দ্বিতীয় পুলকেশীর হাতে নিহত হন।

মঙ্গলেশকে হত্যা করে কীর্তিবর্মণের পুত্র **দ্বিতীয় পুলকেশী** সিংহাসনে বসেন। ইনি ছিলেন এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি মহীশূররাজ গঙ্গ ও কাঞ্চীরাজ **মহেন্দ্রবর্মণকে** তাঁর বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করান। কীর্তি বর্মণ দক্ষিণের চোল, চের ও পাণ্ড্যরাজ্য জয় করে মালব ও গুজরাটে তাঁর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি উত্তরে নর্মদা তীর থেকে দক্ষিণে কাবেরী নদী পর্যন্ত বিশাল সাম্রাজ্যের অধিশ্বররূপে খ্যাত হয়েছিলেন। ৬৪১ খৃষ্টাব্দে হিউয়েন সাঙ্‌ চালুক্য রাজ্য পরিভ্রমণ করেন। তাঁর বিবরণী থেকে জানা যায় হর্ষবর্ধন দক্ষিণ ভারত জয়ের জন্য অগ্রসর হলে, দ্বিতীয় পুলকেশী তাঁকে পরাজিত করেন। অবশেষে পুলকেশী পল্লবরাজ নরসিংহবর্মণের হাতে পরাজিত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। দ্বিতীয় পুলকেশীর পর তাঁর পুত্র **প্রথম বিক্রমাদিত্য** পল্লবদের রাজধানী কাঞ্চী অধিকার করেন। প্রথম বিক্রমাদিত্যের পর বিনয়াদিত্য, বিজয়াদিত্য ও দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য প্রভৃতি রাজগণ রাজত্ব করেন।

চালুক্যদের সঙ্গে রাষ্ট্রকুটদের সংঘর্ষের ফলে এই রাজ্যের পতন হয়। এদেব একটি শাখা একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদীর মধ্যবর্তী বেঙ্গী নামক স্থানে রাজত্ব করে।

চালুক্যরাজগণ হিন্দুধর্মাবলম্বী ছিলেন। বৈদিক যাগ-যজ্ঞে এঁদের শ্রদ্ধা ছিল। অজন্তা ও হাতীগুহায় (এ্যালিফ্যান্টা) এই আমলের শিল্প-নিদর্শনগুলি চালুক্য-রাজগণের ভাস্কর্য, স্থাপত্য ও চিত্রকলার পৃষ্ঠপোষকতার পরিচয় দেয়।

কাঞ্চীর পল্লববংশ ঃ পল্লবগণের সঠিক পরিচয় জানা যায় নি। এরা খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে কাঞ্চীতে রাজ্যস্থাপন করেন। **সিংহবর্মন ও শিবস্কন্দবর্মন** নামে দু'জন পল্লবরাজা অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন।

ষষ্ঠ শতকের শেষদিকে এই বংশের রাজা **সিংহবিষ্ণু** চের, চোল ও পাণ্ড্য রাজ্য জয় করেন এবং সিংহলেও তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। সিংহবিষ্ণুর পর তাঁর পুত্র প্রথম মহেন্দ্রবর্মন সিংহাসনে বসেন। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর সঙ্গে চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর সংগ্রাম শুরু হয়। এই যুদ্ধে পুলকেশী তাঁকে পরাজিত করে উত্তরাঞ্চলের বেঙ্গী রাজ্য অধিকার করেন।

প্রথম মহেন্দ্রবর্মণ তাঁর নাম অনুসারে **মহেন্দ্রবোনি** নামে একটি শহর নির্মাণ করেছিলেন। তিনি শিল্প ও সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। ত্রিচিনোপল্লী চিঙ্গেলপুট ও আর্কট জেলায় সুন্দর সুন্দর মন্দির তাঁর শিল্পানুরাগের উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

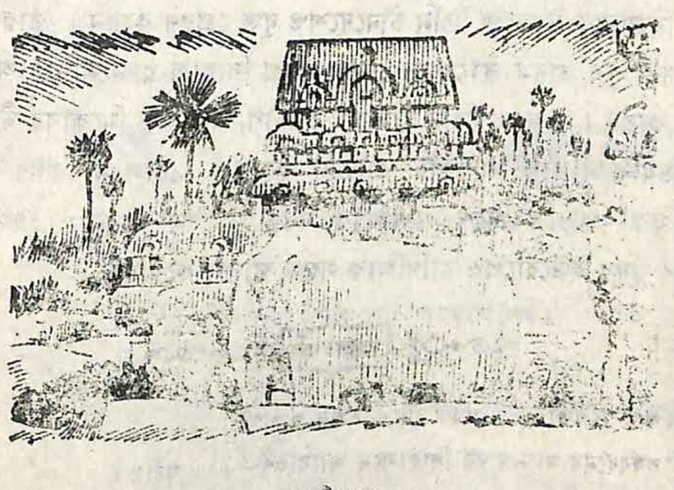
প্রথম মহেন্দ্রবর্মণের পর তাঁর পুত্র নরসিংহবর্মণ পল্লবরাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন। ইনি চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীকে পরাজিত করে বাদামী রাজ্য অধিকার করেন এবং সিংহলে নৌ-অভিযান পাঠিয়েছিলেন। হিউয়েন সাঙ্ নরসিংহবর্মণের রাজ্য পরিদর্শন করেছিলেন। তাঁর বিবরণী থেকে পল্লব রাজ্যের জমির উর্বরতা, উৎপন্ন ফসল এবং ফলমূলের প্রাচুর্যের কথা জানা যায়। এ ছাড়া এই রাজ্যে অসংখ্য বৌদ্ধ মঠ, মন্দির প্রভৃতির কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন।

নরসিংহবর্মনের পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় মহেন্দ্রবর্মণ ও পরমেশ্বরবর্মণ পল্লব সিংহাসনে বসেন, কিন্তু দ্বিতীয় মহেন্দ্রবর্মণ গঙ্গ, পাণ্ড্য ও চালুক্যদের মিলিত আক্রমণের ফলে প্রাণ হারান। অষ্টম শতাব্দী থেকে পাণ্ড্য ও রাষ্ট্রকূটদের সঙ্গে

নিয়ত যুদ্ধ করে পল্লবরাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে। সেই সময় চালুক্যরাজ দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য কাঞ্চী দখল করেছিলেন। অবশেষে নবম শতাব্দীর শেষদিকে চোল আক্রমণের ফলে পল্লবরাজ্যের পতন ঘটে। এই বংশের শেষ রাজা ছিলেন অপরাজিতবর্মণ।

চালুক্য ও পল্লব শিল্প এবং স্থাপত্য ঃ উত্তর ভারত ও সুদূর দক্ষিণ ভারতের মধ্যস্থলে চালুক্য রাজ্য অবস্থিত ছিল। চালুক্য রাজধানী বাদামীতে বহু গুহামন্দির স্থাপন করা হয়েছিল। এই মন্দিরগুলি হিন্দু দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত ছিল। মন্দিরের ভিতরের দেবমূর্তিগুলি ভাস্কর্যের অপূর্ব নিদর্শন। বাদামীতে এখনও অনেকগুলি প্রস্তর-খোদিত মন্দির রয়েছে। এগুলি পল্লব ও দ্রাবিড় শিল্পের অনুকরণে তৈরী। **অহিওলিতে** আবিষ্কৃত **মেগুতি** মন্দির (৬০৩ খৃঃ) এবং **পট্টাডক্কলে** আবিষ্কৃত সঙ্গমেশ্বরের মন্দির (আঃ ৭২০ খৃঃ) চালুক্য শিল্পের অতি সুন্দর স্থাপত্য নিদর্শন।

পল্লবযুগের মন্দিরগুলির মাধ্যমেই দাক্ষিণাত্যের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের



মহাবলীপুরম্

সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। পল্লব রাজধানী কাঞ্চীর কৈলাসনাথের মন্দির এবং মামল্লপুরমের (মহাবলীপুরম্) রথ-মন্দির পল্লবযুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যকে

ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসে চিরন্তন করে রেখেছে। কৈলাসনাথের মন্দিরের ভাস্কর্য অপূর্ব। পল্লবরাজ নরসিংহবর্মণের রাজত্বকালে একটিমাত্র প্রস্তর-খণ্ডকে বিবিধ আকারে খোদিত করে নানাপ্রকার ভাস্কর্য সুষমামণ্ডিত করে মামল্লপুরমের রথ-মন্দির তৈরী হয়েছিল। সীমাহীন সময়, ক্লান্তিবিহীন শ্রম এবং অপরিমিত অর্থব্যয় করে এই শিল্পপ্রচেষ্টা সার্থক করা হয়েছিল। পল্লব স্থাপত্য ও ভাস্কর্য-রীতি সমগ্র দক্ষিণ ভারতের আদর্শ শিল্পরূপে গৃহীত হয়েছিল।

চোল রাজাদের সামুদ্রিক অভিযান ঃ দক্ষিণ ভারতের উপকূলবাসীদের সঙ্গে সমুদ্রের ঘনিষ্ঠ পরিচয় প্রাচীন কাল থেকেই ছিল। এরা ছিল নৌ পরিচালনায় দক্ষ। সেই দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে চোলরাজগণ একটি শক্তিশালী নৌ-বাহিনী গঠন করেন। চোল রাজাদের আমলেই ভারতবাসী সমুদ্র পারে দক্ষিণ-পূর্ব এবং দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন প্রদেশে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করে। দশম শতকের শেষদিকে রাজরাজ চোল নৌ-বাহিনী নিয়ে সিংহল অভিযান করে উত্তরাংশ দখল করেন। আরব সাগরে নৌ-অভিযান করে মালদ্বীপে তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে তিনি চীনদেশেও দূত প্রেরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর, তাঁর পুত্র প্রথম **রাজেন্দ্র চোল** সমগ্র সিংহলে রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। এ ছাড়া তিনি সুমাত্রা, যবদ্বীপ, মালয় ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে নৌ-অভিযান চালিয়ে অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। চোল বণিকগণ পারস্য, পূর্ব-আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে বাণিজ্যিক সম্বন্ধ স্থাপন করেন। এই চোল বণিকগণ সুদূর ইউরোপেও বাণিজ্যিক সম্বন্ধ স্থাপন করেছিল।

সালপঞ্জী

১. গুপ্ত পরবর্তী যুগ—পঞ্চম থেকে সপ্তম শতাব্দী।
২. হর্ষবর্ধনের থানেশ্বরের সিংহাসনে আরোহণ—৬০৬ খৃষ্টাব্দ।
৩. হিউয়েন সাঙ-এর ভারত আগমন—৬৩০—৬৪৫ খৃষ্টাব্দ।
৪. হর্ষপরবর্তী যুগ—অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী।

৫. নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা—আনুমানিক পঞ্চম শতাব্দী।
৬. পালবংশের রাজত্বকাল—অষ্টম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী।
৭. সেনবংশের রাজত্বকাল—দ্বাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী।
৮. বাদামীর চালুক্যবংশের রাজত্বকাল—ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ।
৯. কাঞ্চীর পল্লববংশের রাজত্বকাল—ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে অষ্টম শতাব্দী।
১০. চোলদের রাজত্বকাল—নবম শতাব্দী থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম দশক

অনুশীলনী

মৌখিক প্রশ্ন * * * **এক নম্বর**

১. গুপ্ত-পরবর্তী যুগ বলতে কোন্ সময়কালকে বুঝায় ?
২. হুণদের আদি বাসস্থান কোথায় ছিল ?
৩. হুণদের কোন্ শাখা গুপ্তসাম্রাজ্য আক্রমণ করেছিল ?
৪. গুপ্তসাম্রাজ্য পতনের পর কোন্ রাজা ভারতে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন ?
৫. কার রাজত্বকালে হিউয়েন সাঙ্ ভারত পরিভ্রমণে এসেছিলেন ?
৬. নালন্দার প্রধান অধ্যক্ষের নাম কি ?
৭. যশোবর্ধন কে ছিলেন ?
৮. পরমার বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কে ?

নির্দেশক প্রশ্ন * * * * **তিন নম্বর**

১. গুপ্ত বংশের কোন্ কোন্ রাজা হুণ আক্রমণ প্রতিহত করেন ? এর ফল কি হয়েছিল ? [১+২]
২. হর্ষবর্ধনের সঙ্গে শশাঙ্কের যুদ্ধের কারণ কি ? সংক্ষেপে লিখ। [৩]
৩. নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা সংক্ষেপে আলোচনা কর। [৩]
৪. হর্ষ পরবর্তী যুগে কনৌজে কে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ? তাঁর রাজত্বকাল সংক্ষেপে বর্ণনা কর। [১+২]
৫. রাজপুত জাতি বলতে কাদের বুঝায় ? উত্তর ভারতে প্রাধান্য বিস্তারে তাদের কৃতিত্ব বর্ণনা কর। [১+২]
৬. গুর্জর প্রতিহার রাজ্য কারা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ? তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। [১+২]

৭. পরমার রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে? এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কে ছিলেন? তাঁর সামরিক কৃতিত্ব কি ছিল?

৮. চালুক্য বংশের আদিপুরুষ কে? তিনি কোথায় আধিপত্য বিস্তার করেন? তাঁর রাজধানী কোথায় ছিল? [১+১+১]

৯. গাহড়বাল বংশের শেষ শক্তিমান রাজা কে? তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে পৃথ্বীরাজের শোচনীয় পরিণতিতে তাঁদের ভূমিকা কি ছিল? [১+২]

১০. শশাঙ্ক কে ছিলেন? তিনি প্রথম জীবনে কি ছিলেন? তাঁর রাজধানীর নাম কি? [১+১+১]

১১. বিক্রমশীলা মহাবিহারটি কোথায় ছিল? এটি কে তৈরি করেছিলেন? এই মহাবিহারের অধ্যক্ষের নাম কি? [১+১+১]

১২. চোলরাজগণের সামুদ্রিক ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে সংক্ষেপে লিখ।

রচনাত্মক প্রশ্ন — ৯নম্বর

১. ভারতবর্ষে কোন্ সময় হূণ আক্রমণ হয়? গুপ্ত সাম্রাজ্যের উপর হূণ আক্রমণের প্রভাব আলোচনা কর। [৪+৫]

২. ভারতে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠায় হর্ষবর্ধনের কৃতিত্ব আলোচনা কর। শশাঙ্কের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষের বিবরণ দাও। [৪+৫]

৩. হিউয়েন সাঙের ভারত বিবরণ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর। [৯]

৪. নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর। এটি কোথায় এবং কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল? [৫+৪]

৫. হর্ষ-পরবর্তী যুগে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা আলোচনা কর। [৯]

৬. রাজপুত জাতি কাদের বলা হয়? ভারতের প্রধান প্রধান রাজপুত রাজ্যগুলির বিবরণ দাও। [৯]

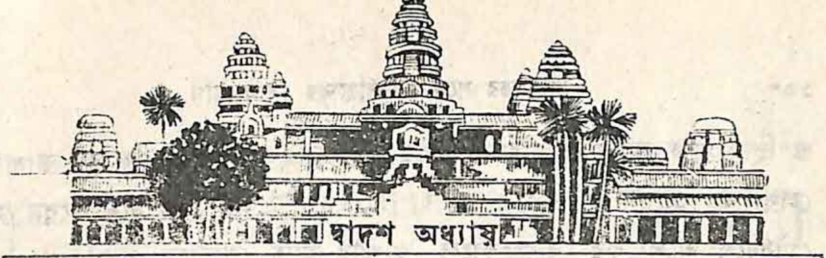
৭. শশাঙ্কের রাজত্বকালে বাংলাদেশের শক্তি ও সমৃদ্ধির বর্ণনা দাও। [৯]

৮. পাল ও সেনরাজগণ কে কোন্ ধর্মাবলম্বী ছিলেন? এদের আমলে বাংলার সমাজ, রাজনীতি, অর্থনৈতিক অবস্থা ও সংস্কৃতির পরিচয় দাও। [৪+৫]

৯. চালুক্য রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও পতনের ইতিহাস আলোচনা কর। [৯]

১০. পল্লবযুগের শিল্প-সংস্কৃতির বিবরণ দাও। [৯]

১১. বিক্রমশীলা ও ওদন্তপুর বিহারের বিবরণ দাও। [৯]



দ্বাদশ অধ্যায়

ভারতের সঙ্গে বহির্ভারতের যোগাযোগ

ভারতবর্ষ এক বিশাল ও বৈচিত্র্যময় দেশ। এর উত্তরে দুর্লঙ্ঘ্য হিমালয় পর্বতমালা, এবং অপর তিনদিকে সমুদ্রের অনন্ত জলরাশি এ দেশকে ঘিরে রেখেছে। এই সব প্রাকৃতিক বাধা সত্ত্বেও অন্য দেশের সঙ্গে এর যোগাযোগ ব্যাহত হয়নি। বরং স্মরণাতীত কাল থেকেই ভারতের সঙ্গে বহির্ভারতের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল।

ঐতিহাসিক যুগে ভারতকে কেন্দ্র করে পূর্ব ও পশ্চিম উভয় দিকেই ব্যাপক বাণিজ্য চলত। এই বাণিজ্যে জলপথ ও স্থলপথ উভয়ই ব্যবহার করা হতো। স্থলপথে আফগানিস্তান, পার্থিয়া, পশ্চিম এশিয়া, মধ্য এশিয়া ও চীনদেশের সঙ্গে ভারতের শিল্প-বাণিজ্যের আদান-প্রদান চলত। সামুদ্রিক বাণিজ্যেও ভারত সুদূর অতীতে খ্যাতি অর্জন করেছিল। ভারতের পূর্ব উপকূলের বন্দরগুলি হতে ভারতীয় বণিকগণ ব্রহ্মদেশ, সিংহল, মালয়, প্রাচ্য দ্বীপপুঞ্জ, শ্যাম, ইন্দোচীন ও চীনদেশ পর্যন্ত বাণিজ্য করতে যেত। এই সব বাণিজ্যপথ ধরে ভারতীয় শিল্প ও সভ্যতা দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে, এবং ভারতীয়গণ নানাদেশে উপনিবেশ স্থাপন করে।

মধ্য এশিয়া ঃ অতি প্রাচীনকালে মধ্য এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করেছিল, এবং এখানে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছিল। মানচিত্রে **পূর্ব তুর্কীস্তান** বলে যে অঞ্চলকে চিহ্নিত করা হয়, তারই অপর নাম **মধ্য এশিয়া**। প্রাচীন ঐতিহাসিকগণ এই অঞ্চলকেই **কাশগড়িয়া** নামে অভিহিত করতেন।

বর্তমানে ঐ অঞ্চল পর্বত ও মরুময়। এই মরুভূমির উত্তর ও দক্ষিণ সীমানায় **খোটান, কাশগড়, ইয়ারকন্দ, কুচা, কারাশর, তুরফান** প্রভৃতি স্থানগুলি মধ্য এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতার কেন্দ্র ছিল। এই সকল স্থানে বালুকা স্তূপ খুঁড়ে মাটির নিচে থেকে বহু বৌদ্ধবিহার, স্তূপ ও হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বার করা হয়েছে। এই সকল স্তূপ, বিহার ও মন্দিরে বহু বৌদ্ধ

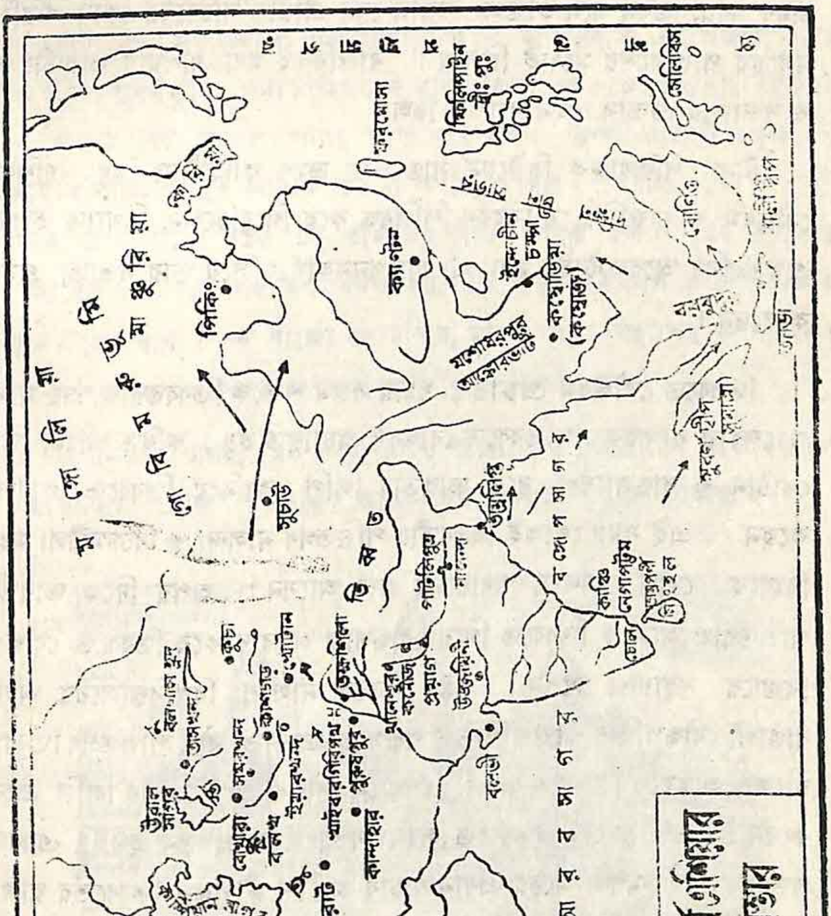
ও হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি ও সভ্যতার নিদর্শন এবং প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষায় লেখা বহু প্রাচীন পুঁথি-পত্র পাওয়া গিয়েছে। কেহ কেহ মনে করেন যে, মৌর্যযুগে অশোকের রাজত্বকালে কাশ্মীর হতে খোটানে প্রথম ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছিল। পরে খৃষ্টীয় প্রথম শতকে কুষাণ সম্রাট কণিষ্কের রাজত্বকালে মধ্য এশিয়ায় বৌদ্ধধর্ম ও ভারতীয় সভ্যতা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এখান থেকেই পরবর্তী কয়েক শতাব্দীর মধ্যে বৌদ্ধধর্ম চীন, কোরিয়া ও জাপানে বিস্তার লাভ করে। হিউয়েন সাঙের ভারত আগমন কালেও খোটানে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। মধ্য এশিয়ার হূণ, তুর্কী প্রভৃতি দুর্ধর্ষ জাতিগুলির মধ্যেও বৌদ্ধধর্ম বিস্তার লাভ করে। ত্রয়োদশ শতকেও এশিয়ায় বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত ছিল।

মধ্য এশিয়ায় অবস্থিত **কুচা** নামক স্থানটিও এক সময় ভারতীয় সভ্যতার কেন্দ্র ছিল। খ্যাতনামা বৌদ্ধপণ্ডিত **কুমারজাব** কুচার অধিবাসী ছিলেন।

মধ্য এশিয়া হতে চীন, মঙ্গোলিয়া, সাইবেরিয়া, কোরিয়া ও জাপানে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়েছিল। বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হওয়ার পরে চীন থেকে বহু পণ্ডিত বৌদ্ধশাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের আশায় ভারতে আসেন। তাঁরা সংস্কৃত ও পালি ভাষা শিখে, বহু বৌদ্ধশাস্ত্র সংগ্রহ করে দেশে ফিরে যান। আবার চীনদেশের আমন্ত্রণে বহু ভারতীয় পণ্ডিত চীনদেশে যান। এঁদের চেষ্টার ফলে চীন, জাপান ও কোরিয়া প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য বিস্তার লাভ করে, এবং চীন সভ্যতার উপর ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি হাজার বৎসর ধরে প্রভাব বিস্তার করে। এই প্রসঙ্গে **ধর্মরত্ন, কাশ্যপমাতঙ্গ, সঙ্ঘভূতি** ও **গুণবর্মণ** প্রভৃতি বৌদ্ধ পণ্ডিতের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

মধ্য এশিয়ায় প্রাচীন ধ্বংসস্তূপের প্রথম আবিষ্কারক রুশীয় প্রত্নতাত্ত্বিকগণ। এরপর ইউরোপের প্রত্নতাত্ত্বিকগণ মধ্য এশিয়ার মরুভূমির বালুকাস্তূপের মধ্য থেকে বহু পুঁথি, চিত্র ও ভাস্কর্যের নিদর্শন এবং দৈনন্দিন ব্যবহারের বিভিন্ন সামগ্রী আবিষ্কার করেন। ভারত সরকার নিযুক্ত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ **ডঃ অরেলস্টাইন** খোটান অঞ্চলের কয়েকটি স্তূপের ধ্বংসাবশেষ ও বালুকা খনন করে মধ্য এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতার প্রসার সম্পর্কে বহু তথ্য ও প্রমাণ

সংগ্রহ করে আনেন। অরেলস্টাইন বলেন—'আমি গোবি মরুপথে ভ্রমণের



মধ্য এশিয়া ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ভারতীয় সভ্যতার বিস্তার

সময় বৌদ্ধ স্তূপ, বিহার, বুদ্ধমূর্তি, দেব-দেবীর মূর্তি, ভারতীয় ভাষা ও

লিপির বহু নিদর্শন দেখেছিলাম। আমি যখন এই ধ্বংসস্তূপের মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করি, তখন মনে হচ্ছিল—আমি যেন প্রাচীন পাঞ্জাবের কোন পরিচিত নগরের পরিবেশের মধ্যেই ছিলাম।' বাস্তবিকই মধ্য এশিয়ায় ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতার প্রভাব এমন ব্যাপক ছিল।

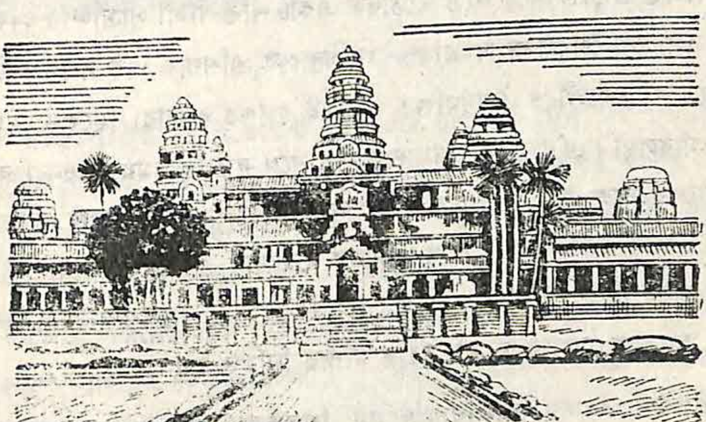
চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে মধ্য এশিয়ায় বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গিয়েছিলেন, বিখ্যাত ইংরাজ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ অরেলস্টাইন মধ্য এশিয়ায় খননকার্য চালিয়ে তার সত্যতা প্রমাণ করেছেন।

তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচার ঃ খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে তিব্বতরাজ স্রং-সান্-**গাম্পোর** রাজত্বকালে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়। কথিত আছে, তিনি খোটান ও বাঙলাদেশ থেকে ভারতীয় লিপি আনিয়ে তিব্বতে প্রচলিত করেন। এই সময় থেকেই তিব্বতীয় পণ্ডিতগণ নালন্দা ও বিক্রমশীলা মহাবিহারে বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য আসেন। অপর দিকে ভারতীয় পণ্ডিতরাও অনেক তিব্বতে গিয়ে বৌদ্ধশাস্ত্র অনুবাদ করে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম বিস্তারে সহায়তা করেন। অষ্টম শতকে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ বাঙালী বৌদ্ধপণ্ডিত **শান্তরক্ষিত** ও **পদ্মসম্ভব** প্রভৃতি বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ তিব্বতরাজের আমন্ত্রণে তিব্বতে যান। সেখানে বৌদ্ধধর্ম ও ভারতীয় লিপি প্রচার করেন। এই সময়েই তিব্বতে **লামা** সম্প্রদায়ের প্রবর্তন হয়। একাদশ শতাব্দীতে বিক্রমশীলা মঠের প্রধান আচার্য **অতীশ দীপঙ্কর** তিব্বতের রাজার আমন্ত্রণে তিব্বতে যান। তিনি তের বছর তিব্বতে থেকে মহাযান বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। অতীশ ছিলেন বাঙালী। বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের পর তাঁর নাম হয়েছিল **শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্কর**। ইনি প্রায় দু'শ বৌদ্ধগ্রন্থ তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ ও রচনা করেন।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় উপনিবেশ ঃ ব্রহ্মের ভিতর দিয়ে স্থলপথে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতবাসীর যাতায়াত ছিল। বাংলার **তাম্রলিপ্ত** থেকে **শুরু** করে মাদ্রাজের **নাগপট্টম পর্যন্ত উপকূলবাসী বণিক ও নাবিকগণ** এই

অঞ্চলে পণ্যদ্রব্যের আদান-প্রদান করত। **মালয় উপদ্বীপ, ইন্দোচীনের দক্ষিণাংশ, ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা, জাভা, বলি** এবং **বোর্ণিও** প্রভৃতি দেশগুলি এমন সমৃদ্ধিশালী এবং উন্নত ছিল যে, ভারতবাসী এই অঞ্চলের নাম দিয়েছিল **সুবর্ণভূমি**। পণ্য বিনিময় ও রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে ভারতীয় হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম এই অঞ্চলে প্রসার লাভ করেছিল। **চম্পা** রাজ্যটি কম্বুজ বা কম্বোজ রাজ্যের পূর্বে আনাম অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। খৃষ্টীয় ১৫০ শতাব্দী থেকে প্রায় বারো বছর এই রাজ্যটির অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল। এই রাজ্যের রাজাদের মধ্যে **জয় পরমেশ্বরবর্মণ, রুদ্রবর্মণ, জয়সিংহবর্মণ** প্রভৃতি রাজার নাম উল্লেখযোগ্য। এই রাজ্যে বহু মন্দির, মঠ ও বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ থেকে হিন্দু এবং বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়।

এখানকার নগর, মঠ ও মন্দির-স্থাপত্যে হিন্দু শিল্পরীতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। মোঙ্গল ও চৈনিক আক্রমণের ফলে চম্পারাজ্য বিধ্বস্ত হয়।



আঙ্কোরভাট

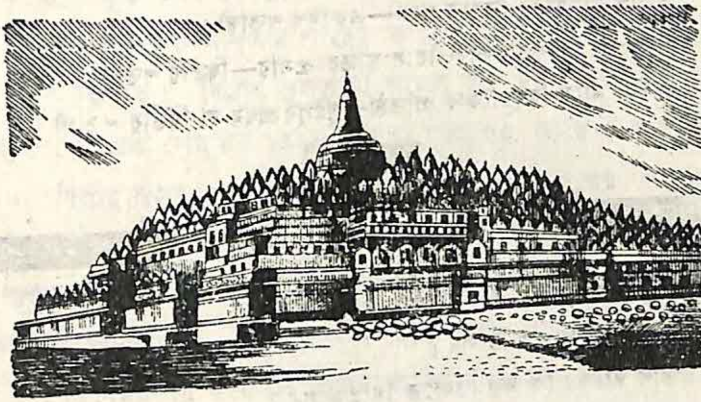
কম্বুজ বা কম্বোজ বলতে বর্তমান শ্যাম বা থাইল্যাণ্ডকে বুঝায়। হিন্দু রাজ্যটি খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। ষষ্ঠ শতাব্দীতে এই রাজ্যের গৌরবময় যুগ আরম্ভ হয়। **জয়বর্মণ**, যশোবর্মণ, সূর্যবর্মণ প্রভৃতি কম্বুজের

শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন। চম্পার চেয়ে কম্বুজ খ্যাতিসম্পন্ন রাজ্য ছিল। **লাওস্, কোচিন, শ্যাম, ব্রহ্মদেশের** একাংশ ও **মালয়** উপদ্বীপ অঞ্চল কম্বুজ রাজ্যের অধীন ছিল। এই রাজ্যের রাজারা ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। হিন্দু স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের অনুকরণে **সূর্যবর্মণ** কর্তৃক নির্মিত **আঙ্কোরভাট** নামে বিশাল বিষ্ণু মন্দিরটি হিন্দুস্থাপত্য ও ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। রাজা **যশোবর্মণ** পল্লব শিল্পরীতির অনুকরণে **আঙ্কোরথম** বা আঙ্কোরধাম নামে এক মনোরম নগরী গড়ে তুলেছিলেন। নগরীর মধ্যে পিরামিড আকৃতির এক শিব মন্দির ছিল, তার মাথায় চল্লিশটি চূড়া ছিল। এর স্থাপত্য শিল্প মনোরম। রাজা **যশোবর্মনের** নাম অনুসারে পরবর্তিকালে আঙ্কোরধামের নাম হয় **যশোধরপুর**।

মালয় ও পূর্বভারতের দ্বীপপুঞ্জগুলির অন্তর্গত **সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ,** ও **বোর্নিও** প্রভৃতি নিয়ে গড়ে উঠেছিল একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য। ইতিহাসে একে বলা হয় **শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য**। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এই সাম্রাজ্যটি ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত। এই বংশের রাজারা ছিলেন মহাযান বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। এঁরা চীন এবং ভারতের সঙ্গে দূত বিনিময় করেন। বাংলার পালবংশের সঙ্গে এঁরা যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন। পালরাজ দেবপালের অনুমতিক্রমে শৈলেন্দ্ররাজ **বালপুত্রদেব** নালন্দায় একটি মঠ নির্মাণ করেন। **কুমারঘোষ** নামে একজন বাঙালী পণ্ডিত শৈলেন্দ্র বংশের ধর্মগুরু ছিলেন। তাঁরই আদেশে মালয়ে **তারাদেবীর** মন্দির নির্মিত হয়।

শৈলেন্দ্র বংশের রাজারা ছিলেন শিল্পকলার গুণগ্রাহী ও পৃষ্ঠপোষক। **বরবুদুরের** বিখ্যাত বৌদ্ধ মন্দির এই বংশের স্থাপত্য প্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। একটি পাহাড়ের উপর নির্মিত মন্দিরটির দেওয়ালের গায়ে অসংখ্য বুদ্ধ মূর্তি এবং রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে অঙ্কিত অনেক দৃশ্য ভারতীয় স্থাপত্যের অপূর্ব মহিমা ঘোষণা করছে। একাদশ শতাব্দীতে চোলরাজ রাজেন্দ্র চোলের এবং পরবর্তিকালে পাণ্ড্য রাজগণের আক্রমণে শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের পতনের পর ত্রয়োদশ শতাব্দীতে **শ্রীবিজয় নামে** একজন রাজা নবদ্বীপে রাজ্যস্থাপন করেন। তাঁর নাম অনুসারে এই রাজ্যের নাম হয় **বিজয়রাজ্য**। এই রাজ্যের রাজধানীর নাম **তিক্তবিল্ব**



বরবুদুরের মন্দির

নগর বা মাজাপহিত। ভারতের সঙ্গে এই রাজ্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এই বংশের একজন রাজপুত্র মালাক্কা দ্বীপে একটি রাজ্য স্থাপন করেন।

তাঁর পরবর্তী রাজা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন, এবং তাঁরই ষড়যন্ত্রে যবদ্বীপের রাজা সিংহাসনচ্যুত হন। এইভাবে ষোড়শ শতাব্দীতে যবদ্বীপে বিজয় রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু রাজ্যের অবসান হয়।

যবদ্বীপ রাজগণ কর্তৃক বলিদ্বীপে হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হওয়ায়, সেখানে ভারতীয় সভ্যতার বিস্তার হয়েছিল। শৈলেন্দ্র বংশের পতন এবং যবদ্বীপের পতনের পর বলিদ্বীপ স্বাধীন হয়। এই রাজ্যে শিব, বিষ্ণু, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেব-দেবীর উপাসনা করা হতো। বর্তমানেও বলিদ্বীপের অধিকাংশ লোক হিন্দুধর্মাবলম্বী।

কালপঞ্জী

১. মধ্য এশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ শুরু—খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী।
২. চীনের সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক যোগাযোগ—খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী।
৩. তিব্বতে মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রসার—সপ্তম শতাব্দী।
৪. অতীশ দীপঙ্করের তিব্বত গমন—একাদশ শতাব্দী।
৫. দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতির প্রসার—দ্বিতীয় শতাব্দী।
৬. কম্বোজ নামে হিন্দুরাজ্যের প্রতিষ্ঠা—খৃষ্টপূর্ব প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দী।

অনুশীলনী

মৌখিক প্রশ্ন * * * **এক নম্বর**

১ কোন্ ভারতীয় পণ্ডিত চীনদেশে গিয়েছিলেন?
২. স্রং-সান্ গাম্পো কে ছিলেন?
৩. অতীশ দীপঙ্কর কি জন্য তিব্বতে গিয়েছিলেন?
৪. অঙ্কোরভাট কে নির্মাণ করেন?

নির্দেশক প্রশ্ন * * * * **তিন নম্বর**

১. মধ্য-এশিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তার সম্পর্কে যে সকল নিদর্শন পাওয়া গেছে, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। [৩
২. দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কিভাবে ভারতীয় উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল? [৩]
৩. তিব্বতের সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ব্যবস্থার বিবরণ দাও। [৩]

রচনাত্মক প্রশ্ন * * * * * * * **৯ নম্বর**

১. মধ্য এশিয়ার সঙ্গে ভারতের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগের কথা বল। [৯]
২. ভারতের সঙ্গে বহির্ভারতের যোগাযোগ কিভাবে গড়ে উঠেছিল? এই যোগাযোগের পিছনে কোন্ উদ্দেশ্য ছিল? [৪+৫]
৩. চীনের সঙ্গে ভারতের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার কথা বর্ণনা কর। [৯]

ত্রয়োদশ অধ্যায়



দিল্লীর সুলতানী আমল (১২০৬-১৫২৬ খৃঃ)

ভারতে তুর্ক-আফগানদের আগমন ঃ দিল্লীর সুলতানী আমল সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে তুর্ক-আফগান শক্তির ভারতে আগমন সম্পর্কে কয়েকটি কথা জানা দরকার। দিল্লীর সুলতানী আমল শুরু হয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দশকে, এবং শেষ হয় ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে মুঘলদের কাছে পরাজয়ের মধ্য দিয়ে। দিল্লীর সুলতানদের এই দীর্ঘ তিন শতাধিক বৎসরের শাসনকালের শুরু সুলতান মামুদ ও মহম্মদ ঘুরীর ভারত আক্রমণের মধ্যে দিয়ে।

সুলতান মামুদ ঃ সুলতান মামুদ ছিলেন **গজনীর** শাসনকর্তা এবং খোরাসানী আফগান। ইনি ছিলেন বীর যোদ্ধা এবং সৈন্য পরিচালনায় দক্ষ। সেই সময়কার ভারতীয় হিন্দুরাজাদের পরাজিত করে ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা ও ভারতের বিপুল ধনরত্ন লুণ্ঠন করার উদ্দেশ্যেই তিনি ভারত আক্রমণ করেন। তিনি মোট ১৭ বার ভারত আক্রমণ করে—হত্যা, লুণ্ঠন প্রভৃতির মাধ্যমে ভারতবাসীদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করেছিলেন। সুলতান মামুদ **থানেশ্বর** এবং **সোমনাথ** মন্দির লুণ্ঠন ও ধ্বংস করে বিপুল ধনরত্ন নিয়ে গজনীতে ফিরে যান।

১০৩০ খৃষ্টাব্দে মামুদের মৃত্যুর পর তাঁর দুর্বল বংশধরদের পরাজিত করে ঘুর রাজ্যের শাসনকর্তা **গিয়াসউদ্দীন মহম্মদ** গজনা অধিকার করেন।

মহম্মদ ঘুরী ঃ গিয়াসউদ্দীন গজনা অধিকার করে তাঁর ভাই **মহম্মদ ঘুরীকে** গজনীর শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। ঘুরী ছিলেন সুদক্ষ সেনাপতি ও উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি। ভারতে তৃতীয় তুর্কী অভিযানের নায়ক ছিলেন ঘোর রাজ্যের সুলতান মহম্মদ ঘুরী। ভারত জয় করে এক বিশাল সাম্রাজ্য গঠন করাই ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। এ ছাড়া ভারতে ইসলাম ধর্ম প্রচার করে মুসলিম জগতে গৌরব অর্জন করাও তাঁর অপর লক্ষ্য ছিল। সে সময় উত্তর ভারতে কয়েকটি হিন্দু রাজা ছিল কিন্তু তাদের মধ্যে কোন ঐক্য ছিল না। সে সময় হিন্দুরাজাদের মধ্যে চৌহান-রাজ পৃথ্বীরাজ ও কনৌজ-রাজ জয়চাঁদ ছিলেন খুবই শক্তিশালী। মহম্মদ ঘুরী এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে ভারত আক্রমণ করেন। ১১৯২ খৃষ্টাব্দে তরাইনের যুদ্ধে মহম্মদ ঘুরী

পৃথ্বীরাজকে পরাজিত করে দিল্লী ও আজমীর অধিকার করেন। এর পর ঘুরী কনৌজরাজ জয়চাঁদকে পরাস্ত করে কনৌজ অধিকার করেন। ফলে উত্তর ভারতের এক বিশাল অঞ্চল তুর্কী অধিকারভুক্ত হয়। ভারতে বিজিত অঞ্চলের দায়িত্ব বিশ্বস্ত অনুচর কুতবউদ্দীন আইবকের উপর দিয়ে মহম্মদ ঘুরী দেশে ফিরে যান। ১২০৬ খৃষ্টাব্দে আততায়ীর হাতে মহম্মদ ঘুরীর মৃত্যু হলে কুতবউদ্দীন দিল্লীতে এক নতুন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশ ইতিহাসে **দাসবংশ** নামে পরিচিত। এই সময় থেকে ভারতে শুরু হয় সুলতানী রাজত্ব।

তুর্ক-আফগানদের ভারত আক্রমণের উদ্দেশ্য ও ধারা ঃ আপাতঃ দৃষ্টিতে দেখা যায়, বিধর্মীদের দমন করে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যই সুলতান মামুদ ও মহম্মদ ঘুরীর ভারত অভিযান। ভারতে স্থায়ী রাজ্য স্থাপনের ইচ্ছা মামুদের ছিল না। ভারতের বিপুল ধনরত্ন লুণ্ঠন করাই ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। অপর পক্ষে, ঘুরীর উদ্দেশ্য ছিল রাজ্যজয় করা। মামুদ তাঁর সৈন্যদলে হিন্দু সৈন্য এবং হিন্দু সেনাপতি নিযুক্ত করেছিলেন, কিন্তু মহম্মদ ঘুরী হিন্দুদের কোন সুযোগ সুবিধা দেননি। মামুদ হিন্দুর বহু মন্দির লুণ্ঠন করে বিগ্রহ নষ্ট করেছেন, কিন্তু একমাত্র গুজরাট ব্যতীত ঘুরীর এই রকম আচরণের কথা জানা যায় না।

সুলতান মামুদ ভারতের বহু ধনরত্ন লুণ্ঠন করে এবং শিল্পীদের বন্দী করে গজনীতে নিয়ে যান। কিন্তু ঘুরীর সম্পর্কে এরূপ দৃষ্টান্ত খুবই কম। মামুদের ভারত অভিযান ছিল বাৎসরিক অনুষ্ঠান। তাঁর যুদ্ধজয়ের প্রেরণা ছিল অর্থলোভ, মন্দির ও বিগ্রহ ধ্বংস করে ধনরত্ন লুণ্ঠন এবং সেই সঙ্গে সামরিক প্রতিষ্ঠা লাভ করা। তাই প্রতি বছর তিনি ভারত আক্রমণ করে অবাধে নরহত্যা ও লুণ্ঠন চালাতেন। অপরদিকে ঘুরী ছিলেন ভিন্ন প্রকৃতির। তাঁর ভারত আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল ধন-রত্নসহ ভারতে অধিকার প্রতিষ্ঠা। মামুদ শিল্প, সাহিত্য ও জ্ঞানী-গুণীর পৃষ্ঠপোষকতা করতেন, কিন্তু তাঁর অর্থলোভ এত বেশী ছিল যে, তার জন্য অবাধ নরহত্যা, অগ্নি-সংযোগ, হিন্দুর দেব-দেবীর মূর্তি ও মন্দির ধ্বংস করে ভারতের বুকে ত্রাসের সঞ্চার করেছিলেন। এদিক থেকে বলা যায়, মামুদের ভারত আক্রমণ ছিল রোমাঞ্চকর। তাঁর অভিযানে ধ্বংস ভিন্ন আর কোন চিহ্ন নাই।

অপরদিকে দেখা যায়, ভারতে মুসলিম রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতারূপে ঘুরীর অবদান মামুদের চেয়ে অধিকতর মূল্যবান। এঁর ভারত অভিযানের চিহ্ন ভারতের প্রতি গ্রামে ও নগরে ইতিহাসের সাক্ষীরূপে চিরন্তন হয়ে আছে।

১২০৬-১৫২৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনশ' কুড়ি বছরে তথাকথিত দাস সুলতান-গণ এবং অপর চারটি মুসলমান রাজবংশের ৩৩ জন সুলতান ভারতে রাজত্ব করেন।

দাস বংশ ঃ কুতবউদ্দীন ও তাঁর পরবর্তী দুইজন সুলতান প্রথম জীবনে ক্রীতদাস ছিলেন, সেইজন্য এই বংশকে দাস বংশ বলা হয়। ১২০৬-১২৯০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মোট ১১ জন সুলতান দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। এই বংশের সুলতানদের মধ্যে **ইলতুৎমিস**, তাঁর কন্যা **সুলতানা রাজিয়া** ও **গিয়াসউদ্দীন বলবনের** নাম উল্লেখযোগ্য।

খলজী বংশ ঃ দাসবংশের পরে ১২৯০-১৩২০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত খলজী বংশের মোট ৬ জন সুলতান দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। **জালালউদ্দীন ফিরোজ খলজী** এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। এই বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান রূপে **আলাউদ্দীন খলজীর** নাম উল্লেখ-যোগ্য।



আলাউদ্দীন খলজী

তুঘলক বংশ ঃ খলজী বংশের পর ১৩২০-১৪১৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তুঘলক বংশের মোট ৯ জন সুলতান দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। **গিয়াসউদ্দীন তুঘলক** এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। **মহম্মদ বিন্ তুঘলক** এই বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান ও এই বংশের শেষ সুলতান **নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ**। তুঘলক বংশের পর তুর্কী সুলতানদের উচ্ছেদ সাধন করে আফগান সুলতানরা রাজত্ব করেন। প্রথমে সৈয়দ ও পরে লোদী বংশ রাজত্ব করে।

সৈয়দ বংশ ঃ সৈয়দ বংশের মোট ৪ জন সুলতান ১৪১৩-১৪৫১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দিল্লীর শাসনকর্তা ছিলেন। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তৈমুর-

লঙের অনুচর খিজির খাঁ। আলাউদ্দীন আলম শাহ এই বংশের শেষ সুলতান।

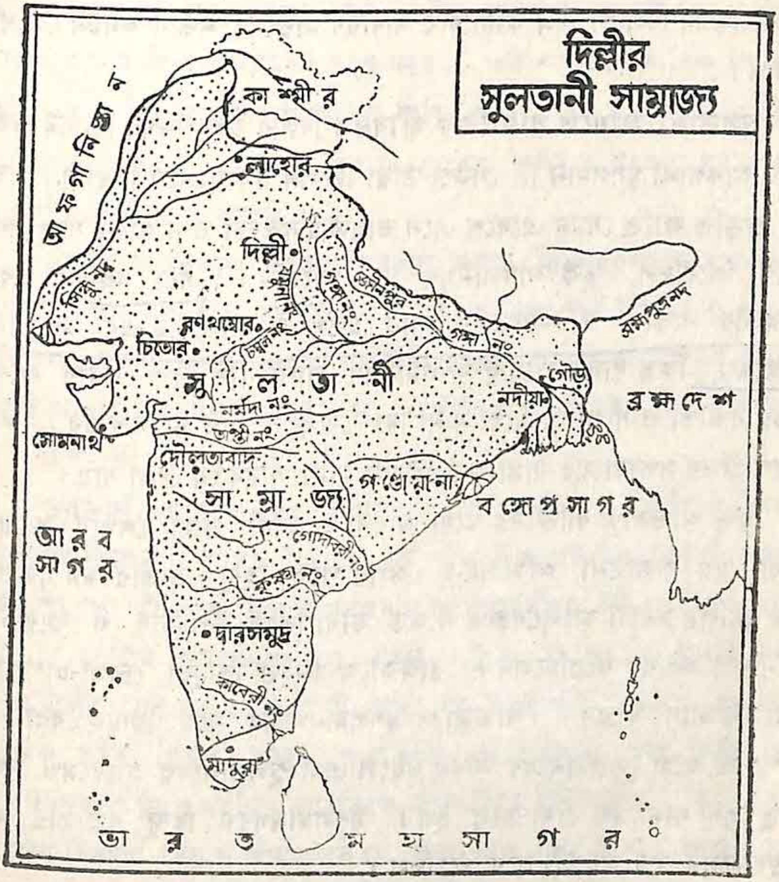


মহম্মদ বিন তুঘলক

লোদী বংশ ঃ বহলুল লোদী এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। ১৪৫১-১৫১৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই বংশের মোট ৩ জন সুলতান দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। এই বংশের উল্লেখযোগ্য সুলতান- সিকন্দর লোদী এবং শেষ সুলতান ইব্রাহিম লোদী।

সুলতানী আমলের রাজনৈতিক অবস্থা ঃ তুর্কীরা এক সুনির্দিষ্ট ধর্ম, রাষ্ট্রীয় আদর্শ ও সামাজিক আচার অনুষ্ঠান নিয়ে ভারতে আসে। তার ফলে শুরু হয় এক নতুন যুগের সূচনা। এদের রাষ্ট্রীয় ধর্ম ছিল ইসলাম। শাসন ব্যবস্থার নামে সুলতানগণ প্রকৃতপক্ষে এদেশে এক-কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। সুলতানই ছিলেন সম্রাট, সৈন্যাধ্যক্ষ ও বিচারপতি। তাঁর কথাই ছিল দেশের আইন। মন্ত্রী, অমাত্য, প্রাদেশিক রাজপ্রতিনিধি প্রভৃতি সকলেই ছিলেন সুলতানের ভৃত্যের ন্যায়। তাই যে কোনও মুহূর্তে কারও কাছে কোনরূপ কৈফিয়ৎ না দিয়ে তাদের পদচ্যুত কিংবা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা চলত। দিল্লীর কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার অনুকরণে প্রাদেশিক শাসকগণও নিজ নিজ প্রদেশে এক-কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সুলতানের আনুগত্য-স্বীকার, নিয়মিত কর ও উপঢৌকন প্রদান এবং প্রয়োজনের সময় সৈন্য সংগ্রহ করে দেওয়া ছাড়া তাদের আর কোনও দায়িত্ব ছিল না। সামরিক শক্তিই ছিল স্বেচ্ছাচারী শাসনতন্ত্রের মূল ভিত্তি। যে সামরিক শক্তির উপর ভিত্তি করে সুলতানগণ রাজ্যশাসন করতেন, তা রাজধানী, দুর্গ, সৈন্যাবাস প্রভৃতি কতিপয় স্থানেই কেন্দ্রীভূত থাকত। অন্য সব জায়গায় হিন্দু সামন্তগণ স্বাধীনভাবেই শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। সুলতানের আনুগত্য স্বীকারের চিহ্ন হিসাবে তারা রাজধানীতে নিয়মিত কর এবং কখনও কখনও নজরাণা পাঠাতেন। প্রজাসাধারণের জীবনযাত্রায় শাসকগণ হস্তক্ষেপ করতেন না। হিন্দুদের জিজিয়া কর দিতে হতো।

এই শাসনব্যবস্থাকে সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বলা চলে। সুলতান এক একটি জায়গীর দিয়ে তাঁর বিশ্বস্ত অনুচরদের বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্তা পদে কিংবা উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করতেন। এরা সুযোগ পেলেই স্বাধীন শাসকরূপে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করতেন।



সুলতানী আমলে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ঃ সুলতানী আমলে মূল রাজস্ব আদায় হতো জমির খাজনা থেকে। অ-মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয় করে ধন-সম্পদ অধিকার করলে, তার এক-পঞ্চমাংশ সুলতানী রাজকোষে জমা দিতে হতো। এছাড়া ভূমি-রাজস্ব, অ-মুসলমানদের উপর জিজিয়া কর আদায় করা হতো। ইসলামের উন্নতিতে মুসলমান প্রজাদের কাছ থেকে

কর আদায় করা হতো। সুলতান রাজ-কর্মচারীদের বেতনের পরিবর্তে জমি দান করতেন। এটিই ছিল প্রচলিত প্রথা। জমির প্রকৃত মালিক ছিলেন সুলতান। সুলতানী আমলে দেশে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি ঘটেছিল। অভিজাতগণ বিলাসে দিন কাটালেও সাধারণ মানুষের অভাব-অনটন লেগেই থাকত।

সুলতানী আমলে সামাজিক জীবন : দিল্লীর সুলতানগণ ছিলেন তুর্কী এবং আফগানী মুসলমান। সেজন্য তাঁরা ছিলেন ইসলামধর্মে বিশ্বাসী। শক, হূণ প্রভৃতি জাতি যেমন এদেশে এসে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে দ্রুত মিশে গিয়েছিল, তুর্ক-আফগানগণ তা পারেনি। এরা বহুদিন পর্যন্ত ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে ঘৃণার চোখে দেখে এসেছে এবং অবিশ্বাস করেছে। কিন্তু দীর্ঘদিন হিন্দু-মুসলমানগণ পাশাপাশি বাস করার ফলে, উভয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে নানা দিক থেকে সংযোগ স্থাপিত হয়। ফল স্বরূপ উভয় সম্প্রদায়ের সামাজিক জীবনে নানা পরিবর্তন দেখা যায়।

হিন্দু অভিজাত ব্যক্তিদের মধ্যে আরবী ও ফার্সী ভাষা শেখার আগ্রহ দেখা দেয় সুলতানী আমলেই। অপর পক্ষে, হিন্দু সভ্যতার মর্ম বুঝবার জন্য মুসলিম মনীষী আল্‌বেরুণী সংস্কৃত ভাষা শিখে, উপনিষদ ও ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। রাজকাজে নিযুক্ত হিন্দুরা চোগা-চাপকান পরা অভ্যাস করেন। অভিজাত মুসলমানগণের সঙ্গে হিন্দুর বৈবাহিক সম্পর্কের ফলে মুসলমানদের অন্দর মহলে এবং সুলতানদের হারেমেও কিছু কিছু হিন্দু সামাজিক প্রথা চালু হয়। মুসলমানগণও হিন্দু সভ্যতার মর্ম অনুধাবনের জন্য আগ্রহী হয়ে উঠেছিল।

হিন্দু ও মুসলিমের পারস্পরিক প্রভাব : ইসলাম ধর্ম ও সমাজবিধি হিন্দুধর্ম ও সমাজবিধি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। হিন্দুধর্মের বিশেষত্ব প্রতীক ও প্রতিমা পূজা। কিন্তু মুসলমানগণ প্রতীক ও প্রতিমাকে ধর্মের প্রবল অন্তরায় মনে করেন। হিন্দু সমাজের মূল ভিত্তি জাতিভেদমূলক বর্ণাশ্রম ধর্ম। অপর পক্ষে সাম্যবাদী মুসলমান সমাজ জাতিভেদ বর্জিত ও গণতান্ত্রিক। এই পার্থক্য হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মধ্যে মিলনের পথে বাধা সৃষ্টি করেছিল। ক্রমে

ইসলাম ধর্ম ভারতে বিস্তার লাভ করে। হিন্দু সমাজে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের অত্যাচারে নিম্নবর্ণের হিন্দুগণ ইসলাম ধর্মের উদারতা ও সাম্যনীতিতে আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। উচ্চ রাজপদ এবং **জিজিয়া** করের জন্যও অনেক হিন্দু ইসলামধর্ম গ্রহণ করে। এই সংকটকালে হিন্দু সমাজকে রক্ষার জন্য হিন্দু শাস্ত্রকারগণ কঠোর বিধি-নিষেধ দ্বারা সামাজিক শাসনের ব্যবস্থা করলেন। এইজন্য অন্যান্য দেশের তুলনায় ইসলাম ধর্ম ভারতে সেরূপ সাফল্য লাভ করেনি।

অপরপক্ষে বহুকাল একসঙ্গে বসবাস করায় হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেনি। ধর্মান্তরিত হিন্দু তার চিরদিনের আচার-ব্যবহার সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে পারেনি, আবার অনেক অভিজাত মুসলমান হিন্দু আচার-ব্যবহারে প্রভাবিত হয়। এইভাবে ধীরে ধীরে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষ কমে গিয়ে সমন্বয় দেখা দেয়।

সুলতানী আমলে শিল্প ও স্থাপত্য : সুলতানগণ স্থাপত্যশিল্পের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তাঁদের উৎসাহে এক অভিনব স্থাপত্যশিল্প গড়ে উঠেছিল। এই স্থাপত্য রীতিতে হিন্দু ও মুসলমান স্থাপত্যরীতির সুষ্ঠু সংমিশ্রণ দেখা যায়। মুসলিম সুলতানগণ যে সকল প্রাসাদ, মসজিদ, স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেছিলেন, সেই সব কাজে যথেষ্ট পরিমাণে হিন্দুশিল্পী নিয়োগ করতেন। অনেক সময় হিন্দুর মন্দির প্রভৃতিরই কিছু পরিবর্তন করে, অথবা তার উপকরণগুলি নিয়ে মসজিদ প্রভৃতিতে রূপান্তরিত করা হতো। ফলে উভয় রীতির মিশ্রণে এইযুগে ভারতবর্ষে যে কেবল এক নতুন স্থাপত্য শিল্পের উদ্ভব হলো তা নয়, স্থান অনুযায়ী তার মধ্যে প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্যও স্পষ্ট হয়ে উঠল।

দাস ও খলজী আমলের স্থাপত্যে অলংকরণ ও নকশার মধ্যে হিন্দু শিল্প-রীতির প্রভাব দেখা যায়। দাসবংশের রাজত্বকালে দিল্লীর কুতুব-**মিনার, আলাই দরওয়াজা** প্রভৃতি নির্মিত হয়। তুঘলক বংশের রাজত্বকালের স্থাপত্যে মুসলিম স্থাপত্যরীতির প্রাধান্য দেখা যায়। **সৈয়দ ও লোদী** বংশের রাজত্বকালে হিন্দু স্থাপত্যের অলংকরণ ও নকশার কাজ বেশী দেখা যায়।

দিল্লীর স্থাপত্যরীতিতে যেমন মুসলমান স্থাপত্যরীতির প্রভাব বেশী দেখা যায়, সেইরকম জৌনপুর ও দক্ষিণ ভারতের স্থাপত্যে হিন্দু স্থাপত্যরীতির প্রাধান্য চোখে পড়ে। জৌনপুরের **অটালা মসজিদ** এর একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। বাংলাদেশের স্থাপত্যরীতিতে মুসলিম স্থাপত্যের প্রভাব পড়লেও বাঙলার শিল্পরীতির বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

সুলতানী আমলে ভাষা ও সাহিত্য ঃ তুর্কী আধিপত্যের সঙ্গে সঙ্গে, সংস্কৃত ভাষা রাজ অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। তবু দেশের প্রাচীন শিক্ষা-কেন্দ্রগুলিতে ব্রাহ্মণগণ সংস্কৃত চর্চা করতেন। দেশে টোল এবং চতুষ্পাঠীর অভাব ছিল না।

লৌকিক ভাষা ও পল্লী সাহিত্যের উত্তরোত্তর বিকাশই এ যুগের সংস্কৃতির নিদর্শন। এই যুগের ধর্মপ্রচারকগণ জনসাধারণের মধ্যে ধর্মপ্রচারের জন্য স্বাভাবিকভাবেই লৌকিক ভাষার আশ্রয় নেন। এইভাবেই বাঙলা, হিন্দু, উর্দু, মারাঠী, গুজরাটী প্রভৃতি জনসাধারণের দৈনন্দিন কাজকর্মের ভাষা কালক্রমে সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হয়ে পড়ে। বাংলায় শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্মপ্রচারের ফলে বাংলাসাহিত্য সমৃদ্ধ হয়ে উঠে। তারও পূর্বে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদাবলী বাংলা ও মৈথিলী সাহিত্যের ইতিহাসে সমধিক প্রসিদ্ধ।

ভক্তিবাদী আন্দোলনের সূচনা ঃ ইসলাম ধর্মের একেশ্বরবাদ, সহজ সরল ধর্মাচরণ ও জাতিভেদমুক্ত সমাজ-জীবন, জাতিভেদে জর্জরিত হিন্দুদের সমাজ-জীবনে আলোড়ন সৃষ্টি করে। সেজন্য সুলতানী আমলে বহু হিন্দু মুসলমান ধর্মে আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। এই ঘটনা সংরক্ষণশীল হিন্দুসমাজে চিন্তার কারণ হয়ে উঠে। সমাজ সংস্কারকগণ অনুভব করেন যে, ঈশ্বর এক এবং অভিন্ন। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই প্রেম ও ভক্তির পথে ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করতে পারে। এদিক থেকে বলা যায়, ইসলাম ধর্মই হিন্দু ধর্ম সংস্কারকদের মনে এই ভাব জাগ্রত করেছিল। এই চিন্তাধারাকে কেন্দ্র করেই **ভক্তিবাদী** আন্দোলনের সূচনা হয়।

কবীর (১৪৪০-১৫১৮ খৃঃ) ঃ মধ্যযুগের ধর্ম-প্রচারকদের মধ্যে কবীর ছিলেন

অন্যতম। তিনি এক দরিদ্র জোলার ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মধ্যে হিন্দু ভক্তিবাদ ও মুসলিম সুফীবাদের সমন্বয় হয়েছিল। তিনি বলতেন—রাম ও রহিমে, কোরাণ ও পুরাণে, কাবা ও কৈলাসে কোন প্রভেদ নেই। একমাত্র ভক্তি হচ্ছে সব ধর্মের মূল কথা। হিন্দু ও মুসলমানকে তিনি পৃথক দেখতেন না। বহু মুসলমান এবং নিম্নবর্ণের অনেক হিন্দু তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। তিনি সহজ হিন্দীতে তাঁর ধর্মমত দোঁহার আকারে রচনা করেন। ইনি ছিলেন ভক্তিবাদী আন্দোলনের প্রধান প্রবক্তা রামানন্দের শিষ্য। অনেকে মনে করেন কবীর চতুর্দশ অথবা পঞ্চদশ শতকের অন্যতম ধর্ম-সংস্কারক ছিলেন।



কবীর

নানক (১৪৬৯-১৫৩৯ খৃঃ) : নানক ছিলেন পাঞ্জাবের অধিবাসী। তিনি তেলির ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। নানক জাতিভেদ মানতেন না, তিনি একেশ্বর-বাদী ধর্মমত প্রচার করেছিলেন। হিন্দু এবং মুসলমান ধর্মের সমন্বয় সাধন তাঁর জীবনের ব্রত ছিল। ঈশ্বরের গুণকীর্তন, জীবের সেবা এবং দৈহিক পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করার উপদেশ দিতেন তিনি। নানকের উপদেশগুলি যে গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে, তার নাম গ্রন্থসাহেব। তাঁর শিষ্যগণ শিখ নামে পরিচিত। কথিত আছে, সত্যের সন্ধানে তিনি বাগদাদ ও মক্কা পরিভ্রমণ করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় ভারতের বহু মুসলমান সাধকও ভারতীয় ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। এঁদের বলা হয় সুফী। সুফীদের জীবনযাত্রা অনেকক্ষেত্রে



নানক

ইসলাম-বিরোধী। এঁরা হিন্দু যোগীর মত ধ্যান, প্রাণায়াম ও নিরামিষ আহার করেন। সুফীসাধক **মৈনুদ্দীন চিশতী, ফরিদউদ্দীন সাত্তার** ও **নিজামউদ্দীন আউলিয়ার** বহু হিন্দু শিষ্য ছিল। ১৫৩৯ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

চৈতন্যঃ ভারতের পূর্বদিকে ভক্তিবাদী আন্দোলনের প্রধান পুরুষরূপে আবির্ভূত হন **চৈতন্যদেব**। ইনি ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে বাংলা দেশের নদীয়া জেলার এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। অতি অল্প বয়সেই তিনি বিপুল পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে তিনি সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেন এবং কাশী, বঙ্গদেশ, উড়িষ্যা ও দাক্ষিণাত্যে জাতিধর্ম নির্বিশেষে ভক্তিধর্ম প্রচার করেন। তাঁর প্রবর্তিত ধর্মের নাম **বৈষ্ণবধর্ম**। তাঁর মতে ভগবৎ প্রেমই একমাত্র মুক্তির উপায়। চৈতন্যদেব জাতিভেদ মানতেন না। হিন্দুসমাজের সকল স্তরের মানুষ এবং মুসলমানদের তিনি সমান চোখে দেখতেন। তাঁর অন্যতম প্রধান শিষ্য **হরিদাস** ছিলেন মুসলমান। ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে তাঁর বিশ্বাস ছিল না। নাম সংকীর্তনই ছিল তাঁর ঈশ্বর আরাধনার সহজতম পন্থা। বাংলার সমাজ ও ধর্মজীবনে চৈতন্যের প্রভাব অপরিসীম। ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে চৈতন্য-দেবের তিরোধান ঘটে।



চৈতন্যদেব

বাংলা দেশ

সুলতানী আমলে বাংলা দেশঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমে বখ্‌তিয়ার খলজীর কাছে লক্ষ্মণসেনের পরাজয়ের পর বাংলায় মুসলিম রাজত্ব শুরু হয়।

দিল্লীর সুলতানদের মনোনীত শাসনকর্তা হয়ে যাঁরা বাংলা দেশে এসেছেন, সুযোগ বুঝে তাঁরা প্রায় সবাই স্বাধীনভাবে বাংলাদেশকে শাসন করেছেন।

ইলিয়াস শাহ (১৩৪৫-১৩৫৭ খৃঃ) ঃ আনুমানিক ১৩৪৫ খৃষ্টাব্দে **হাজী ইলিয়াস শাহ** নিজেকে সমগ্র বাংলার স্বাধীন শাসনকর্তারূপে ঘোষণা করেন। ইনি **সামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ** উপাধি নিয়েছিলেন। তিনি পাণ্ডুয়ায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। ইলিয়াস শাহ বারাণসী পর্যন্ত স্বীয় ক্ষমতা বিস্তার করেন। ইলিশাস শাহের পুত্র **সেকেন্দার** শাহ বীর যোদ্ধা ছিলেন। সেকেন্দারের পুত্র **গিয়াসউদ্দীন আজম** শাহ এই বংশের উল্লেখযোগ্য সুলতান।

হুসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৫ খৃঃ) ঃ হুসেন শাহ বিচক্ষণ যোদ্ধা, সুদক্ষ শাসক, বিদ্যানুরাগী, পরধর্মসহিষ্ণু ও সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কামরূপ (আসাম), কামতাপুর (রংপুর ও কোচবিহার) এবং উড়িষ্যার একাংশ জয় করেন। বিহারের প্রান্ত পর্যন্ত তাঁর রাজ্যসীমা বিস্তৃত ছিল। হুসেন শাহের সময়েই **বিজয় গুপ্ত** ও **বিপ্রদাস** দুইখানি **মনসামঙ্গল** নামক মঙ্গলকাহিনী রচনা করেন। শ্রীচৈতন্যদেব ছিলেন হুসেন শাহের সমসাময়িক। গৌড়ের **সোনা মসজিদ** এঁরই রাজত্বকালে নির্মিত হয়।

ইলিয়াস শাহ ও হুসেন শাহের আমলে বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি এবং অর্থ নৈতিক অবস্থা ঃ বাংলার স্বাধীন সুলতানের আমলে সমাজ জীবনে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় ছিল। সমাজে নারীগণ পুরুষদের উপর নির্ভরশীল এবং গৃহকর্মে নিযুক্ত থাকতেন। পুরুষদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। বাল্য বিবাহ ও সতীদাহ প্রথা চালু ছিল। ঐতিহাসিকগণের মতে সমাজের নৈতিক মান উচ্চ ছিল। ইলিয়াস শাহের প্রচলিত মুদ্রা ও স্থাপত্যকলার নিদর্শন থেকে জানা যায় বঙ্গদেশে তখন শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করত। বাংলায় কৃষিই ছিল প্রধান জীবিকা। বাংলার সুতীবস্ত্র যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিল। এই বস্ত্র বিদেশে রপ্তানী করা হতো। বাংলা দেশের বন্দর দিয়ে বিদেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। **ইবন বতুতা** বলেছেন—"বঙ্গদেশের চেয়ে সস্তায় অন্য কোন দেশে তিনি পণ্যদ্রব্য

বিক্রয় হতে দেখেননি।" সাধারণ মানুষের হাতে নগদ টাকা পয়সা না থাকায়, এই সুযোগ ভোগ করত ধনীরা। গ্রামের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং গ্রামবাসীদের চাহিদাও ছিল খুব সামান্য। তবু এই সময়ে কৃষকদের আর্থিক দিক ছিল সবচেয়ে দুর্দশাগ্রস্ত।

ইলিয়াস শাহী বংশ ও হুসেন শাহের শাসনকালে বাংলার সংস্কৃতি নানাভাবে বিকাশলাভ করে। ইলিয়াস শাহ ও হুসেন শাহ ছিলেন প্রকৃতই সংস্কৃতির অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক। এঁরা বাংলার শিল্প, সাহিত্য ও স্থাপত্যকলার বিকাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

এই সময় বীরভূমের কবি **চণ্ডীদাস** পদাবলী রচনা করেন। হুসেন শাহের সেনাপতি **পরাগল খাঁর** উৎসাহে **কবীন্দ্র পরমেশ্বর** মহাভারত অনুবাদ করেন। **শ্রীকর নন্দী** অনুবাদ করেন মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব। **মালাধর বসু শ্রীকৃষ্ণবিজয়** কাব্য রচনা করে **গুণরাজ খাঁ** উপাধি পান। এছাড়া **কবি কৃত্তিবাসের** রামায়ণ অনুবাদ, হুসেন শাহের মন্ত্রী **রূপ গোস্বামীর** বিদগ্ধ মাধব, ললিত মাধব ও **রঘুনন্দনের** স্মৃতিশাস্ত্র রচনার মধ্যে এই যুগের সংস্কৃত সাহিত্য চর্চার পরিচয় পাওয়া যায়।

বাংলার স্বাধীন সুলতানী আমলে বাংলার স্থাপত্য-শিল্পে হিন্দু ও মুসলমান শিল্পরীতির সমন্বয় দেখা যায়। **সিকন্দর শাহ** কর্তৃক নির্মিত পাণ্ডুয়ার **আদিনা মসজিদ**, হুসেন শাহের আমলে নির্মিত **ছোট সোনা মসজিদ**, ও পরবর্তীকালে **বড় সোনা মসজিদ** এই স্থাপত্য-শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

এই সময়ে বাংলাদেশের হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির মধ্যে যে সমন্বয় ঘটেছিল, তা এই সব সংস্কৃতিক কাজকর্ম ও নিদর্শন থেকে, চৈতন্যদেবের **ভক্তিধর্ম** এবং সত্যপীর, মুশকিল আসান ও ওলাবিবির পূজার প্রচলন থেকে বোঝা যায়।

সুলতানী আমলের শাসনব্যবস্থা : দিল্লীর মত বাংলার সুলতানী শাসন ছিল বাংশানুক্রমিক। সুলতান ও তাঁর কিছুসংখ্যক আমীর ওমরাহ ছিলেন সুলতানী রাজতন্ত্রের প্রধান পরিচালক। শরিয়তের বিধান অনুসারেই বাংলায় সুলতানী শাসন ব্যবস্থা চালু ছিল। এই শাসন ব্যবস্থারও মূল ভিত্তি ছিল

সামরিক শক্তি। দেশের সব জায়গায় গুপ্তচর নিযুক্ত করা হতো। এরা সুলতানকে দেশের খবর পৌঁছে দিত। সুলতানী শাসন ব্যবস্থায় সুলতানই ছিলেন সামরিক শক্তির প্রধান এবং প্রধান বিচারক। ইচ্ছামত তিনি যে কোনও উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে পদচ্যুত করতে পারতেন এবং অপরাধীর দণ্ড বিধান করতেন। দেশের ছোট-খাট বিচার করার ভার ছিল কাজীর উপর। এঁদের বিচারে নিষ্ঠুরতার পরিচয় পাওয়া যায়। সুলতানী শাসনব্যবস্থায় আমীর ওমরাহদের ও আমত্যদের মধ্যে ষড়যন্ত্র অব্যাহত ছিল।

কালপঞ্জী

১. সুলতান মামুদের ভারত-আক্রমণ—১০০০ খৃষ্টাব্দ।
২. মহম্মদ ঘুরীর ভারত-আক্রমণ— ১১৯১—৯২ খৃষ্টাব্দ।
৩. দিল্লীর সুলতানী রাজত্বের শুরু— ১২০৬ খৃষ্টাব্দ।
৪. দাসবংশের রাজত্বকাল— ১২০৬ খৃঃ—১২৯০ খৃঃ।
৫. খলজী বংশের রাজত্বকাল— ১২৯০ খৃঃ—১৩২০ খৃঃ।
৬. তুঘলক বংশের রাজত্বকাল— ১৩২০ খৃঃ—১৪১৩ খৃঃ।
৭. সৈয়দবংশের রাজত্বকাল— ১৪১৪ খৃঃ—১৪৫১ খৃঃ।
৮. লোদীবংশের রাজত্বকাল— ১৪৫১ খৃঃ—১৫২৬ খৃঃ।
৯. ইলিয়াস শাহের রাজত্বকাল— ১৩৪৫ খৃঃ—১৩৫৭ খৃঃ।
১০. হুসেন শাহের রাজত্বকাল— ১৪৯৩ খৃঃ—১৫১৫ খৃঃ।

অনুশীলনী

মৌখিক প্রশ্ন ❋ ❋ ❋ **এক নম্বর**

১. সুলতান মামুদ কে ছিলেন? ২. তিনি কতবার ভারত আক্রমণ করেছিলেন? ৩. মহম্মদ ঘুরী কোথাকার শাসনকর্তা ছিলেন? ৪. ভারতের সুলতানী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে? ৫. দাসবংশের রাজত্বকালের কয়েকটি স্থাপত্য নিদর্শনের নাম কর। ৬. কবীর কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন? ৭. গ্রন্থসাহেব কি? ৮. চৈতন্যদেব কে ছিলেন? ৯. আদিনা মসজিদ কে নির্মাণ করেছিলেন? ১০. নানক কোন্ ধর্মমত প্রচার করেছিলেন?

নির্দেশক প্রশ্ন — **তিন নম্বর**

১. কবীর কে ছিলেন? তিনি কিভাবে তাঁর ধর্মমত প্রচার করতেন? [১+২]
২. নানকের একেশ্বরবাদ ধর্মমতের মূল কথা কি? [৩]
৩. সুফী কাদের বলা হয়? সুফীদের জীবনযাত্রা আলোচনা কর। [১+২]
৪. চৈতন্যদেব ও তাঁর বৈষ্ণবধর্ম সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর। [৩]

রচনাত্মক প্রশ্ন — **৯ নম্বর**

১. সুলতানী আমলে ভারতীয়দের রাজনৈতিক জীবন সংক্ষেপে আলোচনা কর। [৯]
২. তুর্ক-আফগান সুলতানী যুগে ভারতের সমাজ-জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
৩. সুলতানী আমলে হিন্দু-মুসলিম পারস্পরিক সম্বন্ধ সংক্ষেপে আলোচনা কর। [৯]
৪. তুর্ক-আফগান যুগে সুলতানদের স্থাপত্যপ্রীতি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
৫. ভক্তিবাদ আন্দোলন কাকে বলে? এই প্রসঙ্গে চৈতন্যদেবের ভূমিকা আলোচনা কর। [৯]
৬. নানকের একেশ্বরবাদ ধর্মমত সংক্ষেপে আলোচনা কর। [৯]
৭. হুসেন শাহের রাজত্বকালের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। [৯]
৮. হুসেন শাহী আমলে বাঙলার অর্থনীতি ও অর্থ নৈতিক অবস্থার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। [৯]
৯. বাঙলার সাহিত্য ও স্থাপত্যের বিকাশে বাংলার সুলতান ইলিয়াস শাহ ও হুসেন শাহের কৃতিত্ব আলোচনা কর। [৯]
১০. সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ:
(ক) গ্রন্থসাহেব (খ) সুফীবাদ (গ) মহম্মদ ঘুরী (ঘ) সুলতান মামুদ।

মৌখিক প্রশ্ন — **এক নম্বর**

১. —— তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠাতা।
২. নানকের উপদেশগুলি যে গ্রন্থে সংকলিত তার নাম——।
৩. বীরভূমের কবি —— পদাবলী রচনা করেন।
৪. চৈতন্যদেবের অন্যতম প্রধান শিষ্য —— ছিলেন মুসলমান।

চতুর্দশ অধ্যায়



মধ্যযুগের শেষপর্ব

পঞ্চম শতাব্দী থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার আলোচনা করলে দেখা যায়, সামন্ততান্ত্রিক সমাজে নতুন শহর এবং শিল্পের বিকাশকে কেন্দ্র করেই ভূমিদাস প্রথা যেমন সমাপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে, তেমনি ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে আর এক নতুন শ্রেণী। এই শ্রেণীর নাম বুর্জোয়া। এই বুর্জোয়ারাই পরবর্তিকালে সামন্ততন্ত্রের ধ্বংস সাধন করে, প্রতিষ্ঠা করে ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা। কিন্তু এর আগেই কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটতে দেখা যায়।

কনস্টান্টিনোপলের পতন ও তার তাৎপর্য ঃ বাইজান্টিয়াম সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল ধরে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। সমগ্র ইউরোপের মধ্যে শিল্প-সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, এবং বিভিন্ন জ্ঞানচর্চার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল কনস্টান্টিনোপল। ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে **অটোমান তুর্কীরা** কনস্টান্টিনোপল দখল করে। সেইসঙ্গে বাইজান্টিয়াম সাম্রাজ্যের অস্তিত্বও বিলুপ্ত হয়।

বাইজান্টিয়াম সাম্রাজ্যের পতনের ফলে, সেখানকার জ্ঞানী-গুণী মনীষিগণ ইতালীর শহরগুলিতে আশ্রয় নেয়। এর পূর্বেই ইতালির যে নবজাগরণ সূচিত হয়েছিল, কনস্টান্টিনোপলের এই সব মনীষী সেই নবজাগরণকে আরও দ্রুত বিকশিত করে সারা ইউরোপে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেন। এই ঘটনা থেকে বলা যায়, কনস্টান্টিনোপলের পতনের ফলেই ইউরোপীয় রেনেসাঁস বা নবজাগরণ দ্রুততর হয়েছিল।

রেনেসাঁস বা নবজাগরণের বৈশিষ্ট্য ঃ চিন্তা ও ভাবধারার নতুন জাগরণের নাম রেনেসাঁস। অর্থাৎ শিল্প-সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে জানার আগ্রহ, প্রাচীন সংস্কৃতিকে নতুন ভাবে আবিষ্কার, যুক্তি-তর্কের দ্বারা যা কিছু ভালো তা গ্রহণ করা, নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হচ্ছে রেনেসাঁস বা নবজাগরণের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এক কথায় বলা যায় যে, বিভিন্ন দিক থেকে জ্ঞানের প্রসারকেই বলা হয় রেনেসাঁস বা নবজাগরণ।

অপরপক্ষে বলা যায়, মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণা, সামাজিক, অর্থনৈতিক কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বন্ধন থেকে মানুষের মুক্তিলাভের চেষ্টাই হলো রেনেসাঁস বা নবজাগরণের প্রধান বিষয়।

ইউরোপে রেনেসাঁস বা নবজাগরণ মধ্যযুগের শেষপর্বে মানুষের চিন্তার মধ্যে বিপ্লবের সূচনা করেছিল। এর ফলেই মানুষের ব্যক্তিগত মুক্তি ও জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের পথ সহজ করেছিল।

সাংস্কৃতিক ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নবজাগরণের প্রভাব: দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইউরোপ ক্রুসেড অভিযানের মধ্য দিয়ে আরবীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসেছিল। তার ফলে ইউরোপ জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রকে প্রসারিত করবার সুযোগ পায়। ধর্মের দোহাই দিয়ে সাধারণ মানুষের মনে যে উৎসাহ এবং উদ্দীপনা দেখা দিয়েছিল, তা এইবার জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসারের মধ্য দিয়েই ইউরোপ নবজাগরণের দিকে এগিয়ে যায়। এই সময় ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প প্রভৃতি যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে এবং প্রসারিত হয়। মানুষের মনে সব কিছু জানার এবং বোঝার আগ্রহ প্রবল হয়ে ওঠে।

সব মিলিয়ে দেখা যায়, রেনেসাঁস বা নবজাগরণের ফলে, শিল্প-সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, স্থাপত্য-ভাস্কর্য, ইতিহাস ও রাজনীতি প্রভৃতি সব বিষয় সম্পর্কে মানুষের জানার আগ্রহ প্রবল হয়ে ওঠে। **চসার, পেত্রার্ক, বোক্কাচো, মেকিয়াভেলি**-র ইতিহাস ও সাহিত্যচর্চা, **লিওনার্দো-দ্য-ভিঞ্চি, মাইকেল অ্যাঞ্জেলো, রাফায়েল** প্রভৃতি মনীষীর শিল্পচর্চা কোপারনিকাস-এর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, মুদ্রণ শিল্পের জন্য গুটেনবার্গ-এর টাইপ আবিষ্কার, পুরাতন সাহিত্যগুলির উদ্ধার ও নতুন নতুন দেশ আবিষ্কারকে রেনেসাঁস বা নবজাগরণেরই দান বলা যায়।

ইতালিতে রেনেসাঁসের সূত্রপাত হয়েছিল বটে, কিন্তু তার প্রভাব **ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, স্পেন, পর্তুগাল** প্রভৃতি দেশেও ছড়িয়ে পড়ে। ফলে এই দেশগুলিরও শিল্প, সাহিত্য ও জ্ঞানবিজ্ঞান প্রভৃতি উন্নততর হয় এবং প্রসারিত হয়। ফ্রান্সের **মনটেইন,রেবেলেস্মাস** ইংলণ্ডের **চসার, ম্যালোরি টমাস**

মোর, মার্লো, শেক্সপীয়ার স্পেনের **সার্ভেন্তিস**, পর্তুগালের **ক্যামেওনস** প্রমুখ মনীষিগণকে এই রেনেসাঁস বা নবজাগরণের অবদান বলা যায়।

রেনেসাঁস বা নবজাগরণের ফলাফল : রেনেসাঁস বা নবজাগরণের ফলে প্রাচীন ভাবধারা বিনষ্ট হয়ে নতুন চেতনা জাগে মানুষের মনে। তার ফলে মানুষ তার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনকে নতুন করে গড়ে তোলার অনুপ্রেরণা লাভ করে। জনগণ আপন স্বার্থ ও সুখ ভোগের কথা ভুলে গিয়ে দেশের এবং জাতির স্বার্থকেই বড় করে ভাবতে শুরু করে। মানুষকে কিভাবে সম্মান এবং মর্যাদা দিতে হয় সেই জ্ঞান হয় মানুষের। 'সম্রাটের পদ ঈশ্বরের সৃষ্টি'—এই ভুল ধারণা কেটে গিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ শাসন-ব্যবস্থার জন্য এই রেনেসাঁস মানুষের মনে প্রেরণা যোগায় ; রেনেসাঁস প্রাচীন ইতিহাসকে জানার আগ্রহ জাগায় এবং শিক্ষা, সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আসে। মানুষের মনে ভৌগোলিক আবিষ্কারের প্রেরণা এবং তাকে জানা ও দেখারও দুঃসাহসিক প্রেরণা জাগিয়ে তোলে। এই প্রসঙ্গে ইতালির নাবিক **মার্কো পোলোর** চীন ভ্রমণ, **ভাস্কো-ডা-গামা**, **কলম্বাস** প্রভৃতি নাবিকদের দুঃসাহসিক সমুদ্র যাত্রার কথা বলা যায়।

জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা : মধ্যযুগের রাজনৈতিক আদর্শ ছিল পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে সম্রাটের আধিপত্য স্বীকার করা এবং রোমান চার্চের ধর্মীয় ঐক্যের আদর্শ মেনে চলা। মধ্যযুগের শেষদিকে সম্রাট ও পোপের দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে এই আদর্শের পরিবর্তে রাজশক্তির কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফলে সামন্ত ও অভিজাতগণের প্রভাব হ্রাস পায়। নব জাগ্রত বুর্জোয়া শ্রেণীও রাজশক্তির সহায় হয়। এই পরিস্থিতিতে নব-জাগরণের ভাবধারা জাতীয় রাষ্ট্রগঠনের আকাঙ্ক্ষাকে জাগিয়ে তোলে। এরই ফলস্বরূপ পঞ্চদশ শতাব্দীতে **সপ্তম চার্লস, একাদশ লুই ও অষ্টম চার্লস**-এর প্রচেষ্টায় ফ্রান্সে জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয় এবং ফরাসী জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব হয়। অপরদিকে **সপ্তম হেনরীর** চেষ্টায় ইংলণ্ডে

প্রতিষ্ঠিত হয় জাতীয় রাষ্ট্র। **এ্যারাগণ ও ক্যাস্টাইল** পরিবারের মিলনের ফলে স্পেন ঐক্যবদ্ধ জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে যায়।

ইউরোপের বিভিন্ন দেশে জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বে সামন্ততান্ত্রিক শাসনে ও শোষণে জর্জরিত মানুষ, চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে শাসন ও শোষণ থেকে মুক্তির আশায় বিদ্রোহ করে। এই বিদ্রোহ ছিল প্রধানতঃ কৃষক বিদ্রোহ। ইংলণ্ডেও এই রকম একটি বিদ্রোহ হয়েছিল।

এই সময়ে লণ্ডন শহরের উত্তর দিকের গ্রামের কৃষকগণ নানা দিক থেকে অত্যাচারিত হয়ে বিদ্রোহ শুরু করে। লণ্ডনের গরীব অধিবাসিগণ এতে যোগ দেয়। রাজা ভয় পেয়ে বিদ্রোহীদের দাবি সাময়িক ভাবে মেনে নেয়, কিন্তু সামন্ত প্রভুদের সাহায্যে রাজা কৃষক বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত দমন করেন।

পঞ্চদশ শতকের মধ্যেই পুনরায় কৃষকগণ তাঁদের উপর অত্যাচার থেকে মুক্তি আদায় করে। প্রায় সমগ্র ইউরোপে ভূমিদাস প্রথা লুপ্ত হয়। সেই সময় রেনেসাঁস বা নবজাগরণের ফলে ঐক্যবদ্ধ জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের আকাঙ্ক্ষা জাগে ইংলণ্ডবাসীদের মনে। এইভাবেই ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের ফলে মধ্যযুগের সামন্ততন্ত্র ধ্বংস হবার উপক্রম হয়। শেষে শিল্প বিপ্লবের মধ্য দিয়ে বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্বে সামন্ততন্ত্র চিরতরে লোপ পায়। আধুনিক যুগের ধনতান্ত্রিক সমাজগঠনের দিকে এগিয়ে যায় মানুষ। এইভাবেই উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে মানবসভ্যতার ইতিহাস। মধ্যযুগের ইতিহাস তারই একটি অধ্যায়।

সালপঞ্জী

কনস্টান্টিনোপলের পতন—১৪৫৩ খৃষ্টাব্দ। ফ্রান্সে জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা—পঞ্চদশ শতাব্দী।

অনুশীলনী

১। কত খৃষ্টাব্দে কনস্টান্টিনোপল শহরের পতন ঘটে ?

২। 'রেনেসাঁস' কথাটির অর্থ কি ?

বর্ণানুক্রমিক সূচী

সমাপ্ত

